তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

সপ্তদশকল্প।

প্রথম ভাগ।

১৮২৯ শক।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

শাল ১৩১৪। সম্বৎ ১৯৬৪। কলিগতাব্দ ৫০০৮। ১ চৈত্র শনিবার।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সপ্তদশ কল্পের প্রথম ভাগের সূচীপত্র ৵০

অকারাদি বর্ণক্রমে সপ্তদশ কল্পের প্রথম ভাগের সূচীপত্র

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রংনিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সপ্তসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসবে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সায়ংকালের প্রদত্ত উপদেশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

শান্তং শিবমদ্বৈতম্।

অনন্ত বিশ্বের প্রচণ্ড শক্তিসংঘ দশদিকে ছুটিয়াছে, যিনি শান্তং, তিনি কেন্দ্রস্থলে ধ্রুব হইয়া অচ্ছেদ্য শান্তির বল্‌গা দিয়া সকলকেই বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। মৃত্যু চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করিতেছে কিন্তু কিছুই ধ্বংস করিতেছে না, জগতের সমস্ত চেষ্টা স্ব স্ব স্থানে একমাত্র প্রবল কিন্তু তাহাদের সকলের মধ্যে আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য ঘটিয়া অনন্ত আকাশে এক বিপুল সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইতেছে। কতই ওঠা-পড়া, কতই ভাঙাচোরা চলিতেছে, কত হানাহানি, কত বিপ্লব, তবু লক্ষ লক্ষ বৎসরের অবিশ্রাম আঘাত-চিহ্ন বিশ্বের চিরনূতন মুখচ্ছবিতে লক্ষ্যই করিতে পারি না। সংসারের অনন্ত চলাচল, অনন্ত কোলাহলের মর্ম্মস্থান হইতে নিত্যকাল এক মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ। যিনি শান্তং, তাঁহারই আনন্দমূর্ত্তি চরাচরের মহাসনের উপরে ধ্রুবরূপে প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের অন্তরাত্মাতেও সেই “শান্তং” যে নিয়ত বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার সাক্ষাৎলাভ হইবে কি উপায়ে? সেই শান্তস্বরূপের উপাসনা করিতে হইবে কেমন করিয়া? তাঁহার শান্তরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ হইবে কবে?

আমরা নিজেরা শান্ত হইলেই সেই শান্তস্বরূপের আবির্ভাব আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইবে। আমাদের অতি ক্ষুদ্র অশান্তিতে জগতের কতখানি যে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহা কি লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই? নিভৃত নদীতীরে প্রশান্ত সন্ধ্যায় আমরা দুজনমাত্র লোক যদি কলহ করি, তবে সায়াহ্নের যে অপরিমেয় স্নিগ্ধ নিঃশব্দতা আমাদের পদতলের তৃণাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূরতম নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, দুটিমাত্র অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তির অতি ক্ষুদ্র কণ্ঠের কলকলায় তাহা আমরা অনুভবও করিতে পারি না। আমার মনের এতটুকু ভয়ে জগৎচরাচর বিভীষিকা-

ময় হইয়া উঠে, আমার মনের এতটুকু লোভে আমার নিকটে সমস্ত বৃহৎ সংসারের মুখশ্রীতে যেন বিকার ঘটে। তাই বলিতেছি, যিনি শান্তং, তাঁহাকে সত্যভাবে অনুভব করিব কি করিয়া, যদি আমি শান্ত না হই? আমাদের অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য কেবল নিজের তরঙ্গগুলাকেই বড় করিয়া দেখায়, তাহারই কল্লোল বিশ্বের অন্তরতম বাণীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

নানাদিকে আমাদের নানা প্রবৃত্তি যে উদ্দাম হইয়া ছুটিয়াছে, আমাদের মনকে তাহারা একবার এপথে একবার ওপথে ছিঁড়িয়া লইয়া চলিয়াছে, ইহাদের সকলকে দৃঢ়রশ্মিদ্বারা সংযত করিয়া, সকলকে পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যের নিয়মে আবদ্ধ করিয়া অন্তঃকরণের মধ্যে কর্ত্তৃত্বলাভ করিলে, চঞ্চল পরিধির মাঝখানে অচঞ্চল কেন্দ্রকে স্থাপিত করিয়া নিজেকে স্থির করিতে পারিলে, তবেই এই বিশ্বচরাচরের মধ্যে যিনি শান্তং, তাঁহার উপাসনা, তাঁহার উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে।

জীবনের হ্রাসকে, শক্তির অভাবকে আমরা শান্তি বলিয়া কল্পনা করি। জীবনহীন শান্তিত মৃত্যু, শক্তিহীন শান্তি ত লুপ্তি। সমস্ত জীবনের সমস্ত শক্তির অচলপ্রতিষ্ঠ আধারস্বরূপ যাহা বিরাজ করিতেছে, তাহাই শান্তি; অদৃশ্য থাকিয়া সমস্ত সুরকে যিনি সঙ্গীত, সমস্ত ঘটনাকে যিনি ইতিহাস করিয়া তুলিতেছেন, একের সহিত অন্যের যিনি সেতু, সমস্ত দিনরাত্রি-মাসপক্ষ-ঋতুসংবৎসর চলিতে চলিতেও যাঁহার দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে, তিনিই শান্তম্। নিজের সমস্ত শক্তিকে যে সাধক বিক্ষিপ্ত না করিয়া ধারণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকটে এই পরম শান্তস্বরূপ প্রত্যক্ষ।

বাষ্পই যে রেলগাড়ি চালায় তাহা নহে, বাষ্পকে যে স্থিরবুদ্ধি লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছে, সে-ই গাড়ি চালায়। গাড়ির কলটা চলিতেছে, গাড়ির চাকাগুলা ছুটিতেছে, তবুও গাড়ির মধ্যে গাড়ির এই চলাটাই কর্ত্তা নহে, সমস্ত চলার মধ্যে অচল হইয়া যে আছে, যথেষ্টপরিমাণ চলাকে যথেষ্টপরিমাণ না-চলার দ্বারা যে ব্যক্তি প্রতিমুহূর্ত্তে স্থিরভাবে নিয়মিত করিতেছে, সেই কর্ত্তা। একটা বৃহৎ কারখানার মধ্যে কোনো অজ্ঞলোক যদি প্রবেশ করে, তবে সে মনে করে, এ একটা দানবীয় ব্যাপার; চাকার প্রত্যেক আবর্ত্তন, লৌহদণ্ডের প্রত্যেক আস্ফালন বাষ্পপুঞ্জের প্রত্যেক উচ্ছ্বাস তাহার মনকে একেবারে বিভ্রান্ত করিতে থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞব্যক্তি এই সমস্ত নড়াচড়া-চলাফিরার মূলে একটি স্থির শান্তি দেখিতে পায়—সে জানে ভয়কে অভয় করিয়াছে কে, শক্তিকে সফল করিতেছে কে, গতির মধ্যে স্থিতি কোথায়, কর্ম্মের মধ্যে পরিণামটা কি। সে জানে এই শক্তি যাহাকে আশ্রয় করিয়া চলিতেছে তাহা শান্তি, সে জানে যেখানে এই শক্তির সার্থক পরিণাম, সেখানেও শান্তি। শান্তির মধ্যে সমস্ত গতির, সমস্ত শক্তির তাৎপর্য্য পাইয়া সে নির্ভয় হয়, সে আনন্দিত হয়।

এই জগতের মধ্যে যে প্রবল প্রচণ্ড শক্তি কেবলমাত্র শক্তরূপে বিভীষিকা, 'শান্তং' তাহাকেই ফলে ফুলে প্রাণে-সৌন্দর্য্যে মঙ্গলময় করিয়া তুলিয়াছেন। কারণ, যিনি শান্তং, তিনিই শিবম্। এই শান্তস্বরূপ জগতের সমস্ত উদ্দামশক্তিকে ধারণ করিয়া একটি মঙ্গললক্ষ্যের দিকে লইয়া চলিয়াছেন। শক্তি এই শান্তি হইতে উদ্গত ও শান্তির দ্বারা বিধৃত বলিয়াই তাহা মঙ্গলরূপে প্রকাশিত।

তাহা ধাত্রীর মত নিখিলজগৎকে অনাদি-কাল হইতে অনিদ্রভবে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই রক্ষা করিতেছে। তাহা সকলের মাঝখানে আসীন হইয়া বিশ্বসংসারের ছোট হইতে বড় পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদার্থকে পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিয়া তুলি-তেছে। পৃথিবীর ধূলিকণাটুকুও লক্ষ-যোজনদূরবর্ত্তী সূর্য্যচন্দ্রগ্রহতারার সঙ্গে না-ড়ির যোগে যুক্ত। কেহ কাহারো পক্ষে অনাবশ্যক নহে। এক বিপুল পরিবার, এক বিরাট্ কলেবররূপে নিখিল বিশ্ব তাহার প্রত্যেক অংশ-প্রত্যংশ, তাহার প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্য দিয়া একই রক্ষণসূত্রে, একই পালনসূত্রে গ্রথিত। সেই রক্ষণী শক্তি, সেই পালনী শক্তি নানা মূর্ত্তি ধরিয়া জগতে সঞ্চরণ করিতেছে; মৃত্যু তাহার এক রূপ, ক্ষতি তাহার এক রূপ, দুঃখ তাহার এক রূপ; সেই মৃত্যু, ক্ষতি ও দুঃখের মধ্য দিয়াও নবতর প্রকাশের লীলা আনন্দে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ, লাভক্ষতি, সকলেরই মধ্যেই "শিবং" শান্তরূপে বিরাজমান। নহিলে এ সকল ভার এক মুহূর্ত্ত বহন করিত কে। নহিলে আজ যাহা সম্বন্ধ-বন্ধনরূপে আমাদের পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা যে আঘাত করিয়া আমাদিগকে চূর্ণ করিয়া ফেলিত! যাহা আলিঙ্গন, তাহাই যে পীড়ন হইয়া উঠিত। আজ সূর্য্য আমার মঙ্গল করিতেছে, গ্রহ-তারা আমার মঙ্গল করিতেছে, জল স্থল-আকাশ আমার মঙ্গল করিতেছে, যে বিশ্বের একটি বালুকণাকেও আমি সম্পূর্ণ জানি না, তাহারই বিরাট্ প্রাঙ্গণে আমি ঘরের ছেলের মত নিশ্চিন্তমনে খেলা করিতেছি; আমিও যেমন সকলের, সকলেও তেমনি আমার—ইহা কেমন করিয়া ঘটিল? যিনি এই প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর, তিনি নিখি-লের সকল আকর্ষণ, সকল সম্বন্ধ, সকল কর্ম্মের মধ্যে নিগূঢ় হইয়া, নিস্তব্ধ হইয়া সকলকে রক্ষা করিতেছেন। তিনি শিবম্।

এই শিবস্বরূপকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকেও সমস্ত অশিব পরিহার করিয়া শিব হইতে হইবে। অর্থাৎ শুভকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যেমন শক্তিহীনতার মধ্যে শান্তি নাই, তেমনি কর্ম্মহীনতার মধ্যে মঙ্গলকে কেহ পাইতে পারে না। ঔদাসীন্যে মঙ্গল নাই। কর্ম্ম-সমুদ্র মন্থন করিয়াই মঙ্গলের অমৃত লাভ করা যায়। ভালমন্দের দ্বন্দ্ব, দেবদৈত্যের সংঘাতের ভিতর দিয়া দুর্গম সংসারপথের দুরূহ বাধাসকল কাটাইয়া তবে সেই মঙ্গল-নিকেতনের দ্বারে গিয়া পৌঁছিতে পারি—শুভকর্ম্মসাধনদ্বারা সমস্ত ক্ষতিবিপদ্ ক্ষোভ-বিক্ষোভের ঊর্দ্ধে নিজের অপরাজিত হৃদ-য়ের মধ্যে মঙ্গলকে যখন ধারণ করিব, তখনি জগতের সকল কর্ম্মের, সকল উত্থান-পতনের মধ্যে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইব, তিনি রহিয়াছেন, যিনি শান্তং, যিনি শিবম্। তখন ঘোরতর দুর্লক্ষণ দেখিয়াও ভয় পাইব না; নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে আমাদের সমস্ত শক্তিকে যেখানে পরাস্ত দেখিব, সেখানেও জানিব, তিনি রাখিয়াছেন, যিনি শিবম্।

তিনি অদ্বৈতম্। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি এক।

সংসারের সব-কিছুকে পৃথক্ করিয়া, বিচিত্র করিয়া গণনা করিতে গেলে বুদ্ধি অভিভূত হইয়া পড়ে, আমাদিগকে হার মানিতে হয়। তবু ত সংখ্যার অতীত এই বৈচিত্র্যের মহাসমুদ্রের মধ্যে আমরা পাগল হইয়া যাই নাই, আমরা ত চিন্তা করিতে পারিতেছি; অতি ক্ষুদ্র আমরাও এই অপ-রিসীম বৈচিত্র্যের সঙ্গে ত একটা ব্যবহা-

রিক সম্বন্ধ পাতাইতে পারিয়াছি। প্রত্যেক ধূলিকণাটির সম্বন্ধে আমাদিগকে ত প্রতি-মূহূর্ত্তে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবিতে হয় না, সমস্ত পৃথিবীকে ত আমরা এক সঙ্গে গ্রহণ করিয়া লই, তাহাতে ত কিছুই বাধে না। কত বস্তু, কত কর্ম্ম, কত মানুষ; কত লক্ষকোটি বিষয় আমাদের জ্ঞানের মধ্যে বোঝাই হই-তেছে; কিন্তু সে বোঝার ভারে আমাদের হৃদয়মন ত একেবারে পিষিয়া যায় না? কেন যায় না? সমস্ত গণনাতীত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসঞ্চার করিয়া তিনি যে আছেন, যিনি একমাত্র, যিনি অদ্বৈতম্। তাই সমস্ত ভার লঘু হইয়া গেছে। তাই মানুষের মন আপনার সকল বোঝা নামাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অনেকের মধ্যে খুঁজিয়া ফিরিতেছে তাঁহাকেই, যিনি অদ্বৈতম্। আমাদের সকলকে লইয়া যদি এই এক না থাকিতেন, তবে আমরা কেহ কাহাকেও কিছুমাত্র জানিতাম কি? তবে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনোপ্রকারের আদান-প্রদান কিছুমাত্র হইতে পারিত কি? তবে আমরা পরস্পরের ভার ও পরস্পরের আঘাত এক মুহূর্ত্তও সহ্য করিতে পারিতাম কি? বহুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইলেই তবে আমাদের বুদ্ধির শ্রান্তি দূর হইয়া যায়; পরের সহিত আপনার ঐক্য উপলব্ধি করিলে তবে আমাদের হৃদয় আনন্দিত হয়। বাস্তবিক প্রধানত আমরা যাহা-কিছু চাই, তাহার লক্ষ্যই এই ঐক্য। আমরা ধন চাই, কারণ, এক ধনের মধ্যে ছোটবড় বহুতর বিষয় ঐক্যলাভ করিয়াছে; সেই-জন্য বহুতর বিষয়কে প্রত্যহ পৃথক্‌রূপে সংগ্রহ করিবার দুঃখ ও বিচ্ছিন্নতা ধনের দ্বারাই দূর হয়। আমরা খ্যাতি চাই, কারণ, এক খ্যাতির দ্বারা নানা লোকের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ একেবারেই বাঁধিয়া যায়—খ্যাতি যাহার নাই, সকল লোকের সঙ্গে সে যেন পৃথক্। ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, পার্থক্য যেখানে, মানুষের দুঃখ সেখানে, ক্লান্তি সেখানে; কারণ, মানুষের সীমা সেখানেই। যে আত্মীয়, তাহার সঙ্গ আমাকে শ্রান্ত করে না; যে বন্ধু, সে আমার চিত্তকে প্রতিহত করে না; যাহাকে আমার নহে বলিয়া জানি, সেই আমাকে বাধা দেয়, সেই, হয় অভাবের নয় বিরোধের কষ্ট দিয়া আমাকে কিছু-না-কিছু পীড়িত করে। পৃথিবীতে আমরা সমস্ত মিলনের মধ্যে, সমস্ত সম্বন্ধের মধ্যে ঐক্যবোধ করিবামাত্র যে আনন্দ অনুভব করি, তাহাতে সেই অদ্বৈতকে নির্দ্দেশ করিতেছে। আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার মূলেই জ্ঞানে-অজ্ঞানে সেই অদ্বৈতের সন্ধান রহিয়াছে। অদ্বৈতই আনন্দ।

এই যিনি অদ্বৈতং, তাঁহার উপাসনা করিব কেমন করিয়া? পরকে আপন করিয়া, অহমিকাকে খর্ব্ব করিয়া, বিরো-ধের কাঁটা উৎপাটন করিয়া, প্রেমের পথ প্রশস্ত করিয়া। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি—সকল প্রাণীকে আত্ম-বৎ যে দেখে, সেই যথার্থ দেখে। কারণ, সে জগতের সমস্ত পার্থক্যের মধ্যে পরম সত্য যে অদ্বৈতং, তাঁহাকেই দেখে। অন্যকে যখন আঘাত করিতে যাই তখন সেই অদ্বৈতের উপলব্ধিকে হারাই সেই জন্য তাহাতে দুঃখ দেই ও দুঃখ পাই; নিজের স্বার্থের দিকেই যখন তাকাই, তখন সেই অদ্বৈতং প্রচ্ছন্ন হইয়া যান, সেই জন্য স্বার্থসাধনার মধ্যে এত মোহ, এত দুঃখ।

জ্ঞানে, কর্ম্মে ও প্রেমে শান্তকে, শিবকে ও অদ্বৈতকে উপলব্ধি করিবার একটি প-র্য্যায় উপনিষদের 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' মন্ত্রে

কেমন নিগূঢ়ভাবে নিহিত আছে, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখ।

প্রথমে শান্তম্। আরম্ভেই জগতের বিচিত্রশক্তি মানুষের চোখে পড়ে। যতক্ষণ শান্তিতে তাহার পর্য্যাপ্তি দেখিতে না পাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কত ভয়, কত সংশয়, কত অমূলক কল্পনা। সকল শক্তির মূলে যখন অমোঘ নিয়মের মধ্যে দেখিতে পাই শান্তং, তখন আমাদের কল্পনা শান্তি পায়। শক্তির মধ্যে তিনি নিয়মস্বরূপ, তিনি শান্তম্। মানুষ আপন অন্তঃকরণের মধ্যেও প্রবৃত্তিরূপিণী অনেকগুলি শক্তি লইয়া সংসারে প্রবেশ করে; যতক্ষণ তাহাদের উপর কর্তৃত্বলাভ না করিতে পারে, ততক্ষন পদে পদে বিপদ, ততক্ষণ দুঃখের সীমা নাই। অতএব এই সমস্ত শক্তিকে শান্তির মধ্যে সংবরণ করিয়া আনাই মানুষের জীবনের সর্ব্বপ্রথম কাজ। এই সাধনায় যখন সিদ্ধ হইব, তখন জলে স্থলে-আকাশে সেই শান্তস্বরূপকে দেখিব, যিনি জগতের অসংখ্য শক্তিকে নিয়মিত করিয়া অনাদি অনন্তকাল স্থির হইয়া আছেন। এইজন্য আমাদের জীবনের প্রথম অশ্রম ব্রহ্মচর্য্য—শক্তির মধ্যে শান্তিলাভের সাধনা।

পরে শিবম্। সংযমের দ্বারা শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই তবে কর্ম্ম করা সহজ হয়। এইরূপে কর্ম্ম যখন আরম্ভ করি, তখন নানা লোকের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে জড়াইয়া পড়িতে হয়। এই আত্মপরের সংস্রবেই যত ভালমন্দ, যত পাপপুণ্য, যত আঘাত প্রতিঘাত। শান্তি যেমন নানা শক্তিকে যথোচিতভাবে সংবরণ করিয়া তাহাদের বিরোধভঞ্জন করিয়া দেয়—তেমনি সংসারে আত্মপরের শতসহস্র সম্বন্ধের অপরিসীম জটিলতার মধ্যে কে সামঞ্জস্য স্থাপন করে? মঙ্গল। শান্তি না থাকিলে জগৎ প্রকৃতির প্রলয়, মঙ্গল না থাকিলে মানবসমাজের ধ্বংস। শান্তকে শক্তিসঙ্কুল জগতে উপলব্ধি করিতে হইবে, শিবকে সম্বন্ধসঙ্কুল সংসারে উপলব্ধি করিতে হইবে। তাঁহার শান্তস্বরূপকে জ্ঞানের দ্বারা ও তাঁহার শিবস্বরূপকে শুভকর্ম্মের দ্বারা মনে ধারণা করিতে হইবে। আমাদের শাস্ত্রে বিধান আছে, প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য, পরে গার্হস্থ,—প্রথমে শিক্ষার দ্বারা প্রস্তুত হওয়া, পরে কর্ম্মের দ্বারা পরিপক্ক হওয়া। প্রথমে শান্তং, পরে শিবম্।

তার পরে অদ্বৈতম্। এইখানেই সমাপ্তি। শিক্ষাতেও সমাপ্তি নয়, কর্ম্মেও সমাপ্তি নয়। কেনই বা শিখিব, কেনই বা খাটিব? একটা কোথাও ত তাহার পরিণাম আছে। সেই পরিণাম অদ্বৈতম্। তাহাই নিরবচ্ছিন্ন প্রেম, তাহাই নির্ব্বিকার আনন্দ। মঙ্গলকর্ম্মের সাধনায় যখন কর্ম্মের বন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়, অহঙ্কারের তীব্রতা নষ্ট হইয়া আসে, যখন আত্মপরের সমস্ত সম্বন্ধের বিরোধ ঘুচিয়া যায়, তখনই নম্রতাদ্বারা, ক্ষমার দ্বারা, করুণার দ্বারা প্রেমের পথ প্রস্তুত হইয়া আসে। তখন অদ্বৈতম্। তখন সমস্ত সাধনার সিদ্ধি, সমস্ত কর্ম্মের অবসান। তখন মানবজীবন তাহার প্রারম্ভ হইতে পরিণাম পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ;—কোথাও সে আর অসঙ্গত, অসমাপ্ত, অর্থহীন নহে।

হে পরমাত্মন, মানবজীবনের সকল প্রার্থনার অভ্যন্তরে একটিমাত্র গভীরতম প্রার্থনা আছে, তাহা আমরা বুঝিতে জানি বা না জানি, তাহা আমরা মুখে বলি বা না বলি, আমাদের ভ্রমের মধ্যেও, আমাদের দুঃখের মধ্যেও, আমাদের অন্তরাত্মা হইতে সে প্রার্থনা সর্ব্বদাই তোমার অভিমুখে পথ খুঁজিয়া চলিতেছে। সে প্রার্থনা এই যে,

আমাদের সমস্ত জ্ঞানের দ্বারা যেন শান্তকে জানিতে পারি, আমাদের সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা যেন শিবকে দেখিতে পাই, আমাদের সমস্ত প্রেমের দ্বারা যেন অদ্বৈতকে উপলব্ধি করি। ফললাভের প্রত্যাশা সাহস করিয়া তোমাকে জানাইতে পারি না, কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা এইমাত্র যে, সমস্ত বিঘ্ন-বিক্ষেপ-বিকৃতির মধ্যেও এই প্রার্থনা যেন সমস্ত শক্তির সহিত সত্যভাবে তোমার নিকট উপস্থিত করিতে পারি। অন্য সমস্ত বাসনাকে ব্যর্থ করিয়া হে অন্তর্যামিন্ আমার এই প্রার্থনাকেই গ্রহণ কর যে, আমি কদাপি যেন জ্ঞানে, কর্ম্মে, প্রেমে উপলব্ধি করিতে পারি যে, তুমি শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঈশ্বরের উপাসনা।

আমারা প্রতি সপ্তাহে এই সমাজ মন্দিরে ঈশ্বরের উপাসনার জন্য সম্মিলিত হই—ঘরে ঘরে প্রাতঃসন্ধ্যা তাঁহার উপাসনা করি। এই উপাসনা কিসের জন্য? ইহার অর্থ কি? তাৎপর্য্য কি? এই বিষয়ে আজ কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে ইহা বলা আবশ্যক যে ঈশ্বরের উপাসনা বক্তৃতার বিষয় নহে—সাধনার জিনিস; জ্ঞানের কথা নহে, ভাবের উচ্ছ্বাস।

প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিরে,
তিনি হে অকিঞ্চনের গুরু।
ব্যাকুল অন্তরে, চাহরে তাঁহারে,
প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে,
প্রেমদাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি
যে জন যায় নাহি ফেরে।

ব্যাকুল অন্তরে তাঁহাকে চাওয়া, তাঁর ভাবের ভাবুক হওয়া, তাঁর ইচ্ছার সহিত আপন ইচ্ছাকে মিলিত করা, এই তাঁহার উপাসনা। কায়মনোবাক্যে শুদ্ধাচারী হওয়াই তাঁর উপাসনা। সকল ঘটনাতে তাঁর হস্ত দেখা—তাঁর নিকট সুখ দুঃখ নিবেদন, পাপ বিমোচনের জন্য তাঁর নিকট ক্রন্দন—তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ; তাঁর যা আদেশ আমার তা কর্ত্তব্য, যাহা কর্ত্তব্য তাহাতেই আমার আনন্দ, এইরূপে তাঁহার সহিত আত্মার সম্পূর্ণ যোগই তাঁহার উপাসনা। সুখের সময় সেই সর্ব্বসুখদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, দুঃখে তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর—এই তাঁহার উপাসনা। আমরা অতি দুর্ব্বল; আপনার উপরেই নির্ভর করিয়া কিছুই করিতে পারি না। আপনার বুদ্ধিবলে, আপনার পুণ্যবলে, আমার জীবনের পরমলক্ষ্য সম্পন্ন করিতে পারি না। "যখন আপনাকে এই প্রকার ক্ষীণ, হীন, মলিন মনে হয়, তখন স্বভাবতই আমাদের আশ্রয়দাতা পিতাকে আহ্বান করি, তখন তাঁর প্রতি আমাদের সমুদয় নির্ভর যায়, তখন আপনাকে নিতান্ত অনন্য গতি জানিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করি। তখনই তাঁহার নিকট আমার প্রার্থনা যায়, আমার ক্রন্দন যায়। তখন দেখিতে পাই, তিনিই আমার আশা, তিনিই আমার ভরসা, তিনিই আমার একমাত্র নির্ভরের স্থান। তখন আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে এই প্রার্থনা সহজে উদয় হয় "অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও;" এই আন্তরিক নির্ভরের ভাবের প্রকাশই উপাসনা। এক কথায় ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের আত্মার স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস—তাহাই উপাসনা।

সহজেই ধায় নদী সিন্ধু পানে, কুসুম করে গন্ধদান—
মন সহজে সদা চাহে তোমারে, তোমাতেই অনুরাগী,
মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।

উপাসনার সময় ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। ঈশ্বর যিনি অতীন্দ্রিয় নিরাকার তাঁহাকে জাগ্রত জীবন্ত দেবতা রূপে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা কঠিন এ কথা সত্য; অব্যক্তের উপাসনা দেহধারীর পক্ষে অতি কষ্টকর—এই যে গীতার বচন ইহা ঠিক—কিন্তু যদিও ইহা বহু সাধনা সাপেক্ষ তথাপি ইহা না হইলেই নয়। বলা বাহুল্য যে ব্রহ্মদর্শন বিনা ব্রহ্মোপাসনা সম্ভব নহে—মৃত ব্যক্তির সহিত কি কখন কাহারো আলাপ করিতে প্রবৃত্তি হয়?

উপনিষদ বারম্বার উপদেশ দিতেছেন—

তমাত্মস্থং যে হনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং।
তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।

তাঁহাকে যখন আমরা নিকটস্থ, আত্মস্থ করিয়া দেখি, তখন আমাদের পুণ্যকর্ম্মে উৎসাহ, পাপের ভয় হয়—তখন তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করিয়া আমরা কৃতার্থ হই।

ঈশ্বরের এই যে উপাসনা ইহা মৌখিক, বাহ্যিক নহে—মৌখিক উপাসনায় কোন ফল নাই। উপাসনার সময় অকপট সরল হৃদয়ে তাঁহার নিকটে যাইতে হয়। ছদ্মবেশে মানুষ ভুলিতে পারে কিন্তু সেই সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরের কাছে মুখে এক মনে এক, এরূপ কপটতা রক্ষা পায় না।

এইরূপ উপাসনার জন্য যখন আমরা প্রস্তুত হই তখন অতীতের জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে পাপ প্রবৃত্তি দমন করিবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য বল প্রার্থনায় আত্মার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। আমরা যে দিবাবসানে ঈশ্বরের উপাসনার জন্য এখানে আসিয়াছি আমাদের মনে কি ভাব উদয় হইতেছে? অতীত দিবসের জীবন-কাহিনী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আপনাকে কি ক্ষুদ্র মনে হয়—আপনার প্রতি কতই ধিক্‌কার উপস্থিত হয়। দেখিতে পাই আমার যে মহান্ আদর্শ তাহার কত নীচে পড়িয়া আছি! যে চিন্তা মনে স্থান দিবার নহে তাহা দিয়াছি, যে বাক্য বলিবার নহে তাহা বলিয়াছি—যে কর্ম্ম করিবার নহে তাহা করিয়াছি। প্রলোভনে পড়িয়া ধর্ম্মের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছি—প্রবৃত্তি স্রোতে ভাসিয়া ঈশ্বরকে ভুলিয়া গিয়াছি, এই ত আমাদের হীনদশা! তাই এখন ঈশ্বরকে ডাকিতেছি—

আপনা প্রতি নিরখি না দেখি নিস্তার,
প্রভু না দেখি নিস্তার,
একমাত্র ভরসা হে করুণা তোমার।

হে প্রিয়মিত্র! এই করুণাগুণে যদি ভবিষ্যতে তোমার চিরপোষিত পাপ প্রবৃত্তির উপর জয়লাভ করিতে পার—যদি বিষয়ের প্রলোভন অতিক্রম করিয়া তোমার অন্তরের সাধু প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পার, তোমার জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে বল পাও, সাহস পাও, উৎসাহ পাও, তবে তোমার উপাসনার ফল ফলিয়াছে বুঝিতে পারিবে।

এই প্রসঙ্গে মহাকবি সেক্সপিয়রের Hamlet নাটকের একভাগ উল্লেখ যোগ্য মনে করিতেছি।

আপনারা অনেকে ইংলণ্ডের মহাকবি সেক্সপিয়রের হ্যামলেট নাটক পড়িয়া থাকিবেন। তার গল্পটা সংক্ষেপে এইঃ—হ্যামলেটের পিতা ডেনমার্ক দেশের রাজা ছিলেন।

হ্যামলেটর পিতৃব্য Claudius আপনার ভ্রাতাকে বধ করিয়া রাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছেন—মৃত রাজার মহিষীকে—আপন ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহ করিয়া রাজত্ব করিতেছেন। এই সূত্রে রাজা আর রাজকুমার হ্যামলেট—ইঁহাদের মধ্যে ঘোরতর বাদবিবাদ চলিতেছে। রাজা মনে মনে ভাবিতেছেন হ্যামলেটকে দেশান্তরে নির্ব্বাসিত করিবেন—রাজকুমার ও একটা সুযোগ খুঁজিতেছেন, কখন্ রাজাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারেন। এই সুযোগ উপস্থিত। রাজা প্রাসাদের এক ঘরে আছেন—হ্যামলেট গিয়া দেখেন তিনি তখন পূজায় ব্যস্ত। তাই তাঁর নিজের অভিসন্ধি হইতে বিরত হইলেন—ভাবিলেন ও অবস্থায় হত্যা করাটা ঠিক হয় না, কেন না উহাতে হতব্যক্তির পরকালে সদ্গতি হইবারই সম্ভাবনা। এদিকে রাজা প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইলেন—সেই সময়ে তাঁহার মনে যে নানা ভাব তরঙ্গিত হইতেছে নাটকে তার একটি সুন্দর চিত্র আছে—এটি আমার আলোচিত বিষয়ের উপযোগী তাই আপনাদের শোনাইবার ইচ্ছা করিতেছি। মূল এবং বাঙ্গলা অনুবাদ দুই বলিব। যাঁরা মূল ভাষা না জানেন তাঁহারা অনুবাদে তার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন।

রাজার আত্মপরীক্ষার বর্ণনা এইরূপ :—

রাজার আত্মগ্লানি।

হায় কি বিষম পাপ দহিছে আমায়!
পূতিগন্ধ উঠে তার স্বর্গ অভিমুখে।
সৃষ্টির আদিমকালে পড়ে অভিশাপ
যার পরে—ভ্রাতৃহত্যা।—সেই মহাপাপ।
প্রভুপদে এ বেদনা চাহি নিবেদিতে—
কিন্তু নাহি পারি। ইচ্ছা যতই প্রবল,
অপরাধ গুরুতর রোধে তার বেগ।
দ্বৈনৌকায় পদক্ষেপে উভয় শঙ্কট
উপস্থিত! কোন্ দিকে যাই—নাহি জানি;
কোন দিকে নাহি গতি—দাঁড়াই স্তম্ভিত!
ভ্রাতৃরক্ত-কলঙ্কিত এই পোড়া হাতে
পড়ে যদি আরো ঘোর কলঙ্ক-কালিমা,
কি তাহাতে? নাহি কি রে স্বর্গের অমৃত
ধারা হেন, হয় যাহে কলঙ্ক-মোচন?
তুষার-ধবল পুন? প্রভু কৃপাগুণে
কি না হয় ভবে? পাপভয় পরিহরি
পাপী যদি তার গুণে তরিয়া না যায়,
কিসের সে? প্রার্থনার বলই বা কিসের,
দ্বিবিধ কি নহে তাহা? পাপের আশঙ্কা হেরি
হয় তাহা আগু হতে করে সাবধান,
নহে ত পতিত জনে তাঁর ক্ষমাগুণে
করে পরিত্রাণ। চাহ তবে মুখ তুলি,
অপরাধ এ আমার হয়েছে মার্জ্জনা।
কিন্তু হায়! কি কথায় করি এ প্রার্থনা?
"ক্ষম প্রভু ভ্রাতৃহত্যা-অপরাধ মোর"?
বিহিত প্রার্থনা এ কি? নহে তা সম্ভব।
যে উদ্দেশে হত্যা এই করেছি সাধন—
ঐশ্বর্য্য-আকাঙ্ক্ষা, রাজ্য, মহিষী আমার,—
সকলি রয়েছে মোর ভোগে। হায়, হায়,
মার্জ্জনা কেমন পাব ভুঞ্জি পাপ ফল?
পঙ্কিল সংসার স্রোতে দেখা যায় বটে,
অর্থবলে ধর্ম্ম কভু হয় পরাহত;
অন্যায় অর্জ্জিত যাহা, সেই অর্থ দানে
অপরাধী বিচার কিনিয়া লয় কভু;
সে বিচারে চোর হয় সাধু বলে গণ্য।
হোথা ওসবার কিন্তু ব্যর্থ মন্ত্রবল।
সেই যে অন্তরযামী তাঁর ন্যায়াসনে
ছলনায় নাহি ফল। নিজ মূর্ত্তি ধরি
করম যাহার যাহা হয় প্রকাশিত;
এমন কি, অপরাধী আপন বিপক্ষে
আপনিই দেয় সাক্ষ্য তন্ন তন্ন করি।
কি রহিল তবে? অনুতাপ—অনুতাপ—
কি না হয় অনুতাপে? কিন্তু কি উপায়,
অনুতাপ অণুমাত্র মনে নাহি যবে?
হায়, হায়, একি দশা হলরে আমার!
মৃত্যুর কালিমাপূর্ণ রে দগ্ধ হৃদয়!
রে প্রমত্ত মন মম, বিহঙ্গম যথা
পলাবার তরে করে যতই প্রয়াস
জালে তত পড়ে জড়াইয়া, ওরে সেই
দশা তোর!
দেবতারা রক্ষা কর দীনে।

শেষ চেষ্টা করি দেখি কি হয় এবার।
আড়ষ্ট এ জানু মোর হোক্ অবনত!
হৃদয় বজ্র-কঠিন, হোক্ তাহা এবে
কোমলাঙ্গ নবজাত শিশুর সমান!
পূর্ণ হোক্ মোর মনস্কাম! শুভমস্তু।
ঊর্দ্ধে উঠে বাণী মম, ভূতলে পড়িয়া রহে মন,
না যায় প্রভুর কাছে, অন্যমনা শূন্য সে বচন।

HAMLET ACT III.

(Scen III.)

Oh' my offence is rank, it smells to Heaven ;
It hath the primal, eldest curse upon't—
A brothar's murder.—Pray can I not !
Though inclination be sharp as t'will,
My stronger guilt defeats my strong intent,s
And like a man, to double business bound,
I stand in pause wheıe I shall first begin,
And both neglect. What if this curse d hand,
Were thicker than itself with brother's blood ?
Is there not rain enough in the sweet heaven
To wash it white as snow ? Whereto serves merey,
But to confront the visage of offence ?
And what's in prayer but this two-fold force--
To be forestalle'd ere we come to fall
Or pardon'd being down ? Then I'll look up—
My fault is past.—But oh what form of prayer
Can serve my turn ? "Forgive me my foul murder ?"
That cannot be, since I am still possess'd
Of those effects for which I did the murder—
My Crown, my own ambition and my Queen—
May one be pardon'd and retain the offence?
In the corrupted currents of this world,
Offence's gilded hand may shove by justice,
And oft 'tis seen, the wicked prize itself
Buys out the law. But 'tis not so above ;
There's no shuffling, there the action lies
In its true nature. and we ourselves compell'd,
Even to the teeth and forehead of our faults,
To give in evidence—What then ? What rests ?
Try what repentance can and what can it not ?
Yet what can it when one cannot repent ?
O wretched state ! O bosom black as death !
O lime d soul, that struggling to be free,
Art more engaged ! Help angels ! Make assay !
Bow stubborn knees, and heart, with strings of steel,
Be soft as sinews of the new-born babe !
All may be well—
My words fly up, my thoughts remain below,—
Words, without thoughts, never to Heaven go.

আমরা এই নাট্যাংশ হইতে কি উপদেশ পাইতেছি? প্রথম এই, যে মৌখিক বাহ্যিক প্রার্থনার কোন ফল নাই। প্রার্থনা হইতে যদি কোন ফল প্রত্যাশা কর তবে সরল হৃদয়ে, অন্তরের সহিত প্রার্থনা করা চাই। মুখে এক, মনে এক, এরূপ কপট ব্যবহারে লোকে ভুলিতে পারে কিন্তু সেই অন্তর্যামী পুরুষকে ভোলান যায় না।

আর কি, না প্রার্থনার ফল দুইপ্রকার। হয় তাহা প্রলোভন সম্মুখে দেখিয়া আগেই আমাদিগকে সাবধান করিয়া দেয়, নয় ত পাপে পড়িবার পর ঈশ্বরের ক্ষমাগুণে পতিতকে উদ্ধার করে। কিন্তু আমরা সেই ক্ষমার কখন্ অধিকারী হই? শুধু মৌখিক অনুতাপে নহে—দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া পাপ হইতে বিরত হওয়া এবং পাপের ফলত্যাগ করা—ইহা ব্যতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না, অনুতাপ কখনই ফলদায়ী হয় না। ইচ্ছানুরূপ পাপের ফলও ভোগ করিব, ক্ষমা ও লাভ করিব, ইহা কখন সম্ভবে না।

হে পরমাত্মন্! আমরা তোমার দর্শন লাভের জন্য তোমার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। যদি তোমায় আমায় কোন ব্যবধান থাকে তাহা উন্মোচন কর। যদি তোমাকে ছাড়িয়া আমি কোন উপদেবতাকে পূজা করিয়া থাকি, লোভে পড়িয়া কাহারো প্রতি অন্যায় করিয়া থাকি, স্বার্থসাধনের জন্য পরপীড়নে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি, লোকভয়ে ধর্ম্ম বিমুখ হইয়া থাকি, কুৎসিত কার্য্যে এই জীবনের উপর কলঙ্ক আনিয়া আপনি আপনার বিনাশ করিয়া থাকি, তবে হে ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর! তুমি তাহার বিচার কর। আমরা যদি তোমার নিকটে অপরাধী হই, তবে আমাদিগকে সহস্র দণ্ড দাও কিন্তু আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না। যাহাতে এই সকল পাপ তাপ হইতে উদ্ধার হইতে পারি এরূপ বল দেও। তুমি বল দেও, বীর্য্য দেও, ধৈর্য্য শিক্ষা দেও, ক্ষমা শিক্ষা দেও। আমরা যেন তোমার প্রসাদে নবজীবন লাভ করিয়া তোমার পুণ্য পথে দিন দিন অগ্রসর হইতে পারি, এইরূপ অনুগ্রহ কর।

ভয় হতে তব অভয় মাঝে নূতন জনম দেও হে।
হীনতা হতে অক্ষয় ধনে, সংশয় হতে সত্য সদনে,
জড়তা হতে নবীন জীবনে নূতন জনম দেও হে।
আমার ইচ্ছা হইতে প্রভু তোমার ইচ্ছা মাঝে,
আমার স্বার্থ হইতে প্রভু তব মঙ্গল কাজে,
অনেক হইতে একের ডোরে, সুখদুখ হতে শান্তির ক্রোড়ে,
আমা হতে নাথ তোমাতে মোর নূতন জনম দেও হে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শিখ-ধর্ম্ম।

ভারতে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইয়ত্তা নাই। আজ আমরা শিখগুরু বাবা-নানকের ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মশাস্ত্রের সংক্ষেপ আভাস দিব। বাবা-নানক লাহোরের সান্নিধ্যে রাবিতীরে টালবন্দী গ্রামে ক্ষেত্রী বংশে ১৪৬৯ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসার বাস করিতেছিলেন, একদিন নদীস্নানে গমন করিলে, কথিত আছে, অকস্মাৎ দেবদূত কর্ত্তৃক ভগবানের সম্মুখে নীত হন এবং তাঁহারই নিকট হইতে দৈবজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহারই আদেশে ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন। ঈশ্বরের ইঙ্গিত পাইয়া নানক স্ত্রীপুত্র সকলই পরিত্যাগ করিয়া মর্দ্দানা নামক জনৈক অনুচর লইয়া বাহির হইলেন। তাঁহার ফকিরী জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা না ঘটিলেও তাঁহার নাম—তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অক্ষয় ও অমর হইয়া থাকিবে। সম্রাট বাবরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিলে, বাবর তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। শিখ অর্থাৎ শিক্ষার্থী এই উপাধি নানক তাঁহার মতাবলম্বিগণকে প্রদান করেন। শিখ-ধর্ম্মগ্রন্থের বহুল অংশ নানকের রচনা। তাঁহার রচিত জপু বা জপজি ভাষা ও ভাবের উৎকর্ষে অতীব মনোরম। ভাষাকে সমুন্নত করিবার জন্য নানকের প্রাণগত চেষ্টা ছিল। পঞ্চম গুরু অর্জ্জুন, নানকের রচনার সহিত অন্যান্য সাধুগণের উক্তি সংযোজিত করিয়া যে আকারে শাস্ত্র প্রকাশ করেন, তাহাই আদি-গ্রন্থ বলিয়া বিদিত। মৃত্যুর পূর্ব্বে নানক কর্ত্তারপুরে নিজ পরিবারের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ঐ স্থানেই ১৫৩৮ অব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

পঞ্জাবী ভাষায় আদিগ্রন্থ লিখিত হইলেও ইহার ভাষা সর্ব্বত্র সমান নহে। পরবর্ত্তী সময়ের প্রক্ষিপ্ত-অংশে ভাষার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এই আদিগ্রন্থে দুই-

জন মারহাট্টা কবির রচনা দেখিতে পাওয়া যায় ; উহাঁদের নাম নামদেব ও ত্রিলোচন। কবির ও ফরিদের অনেক অমূল্য উক্তিও এই আদি-গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। নানক-প্রবর্ত্তিত শিখধর্ম্মের সঙ্গে গোবিন্দ বা দশম-গুরু গোবিন্দ সিংহের নামের ঘনিষ্ঠতম যোগ। গোবিন্দের বয়স ১৫ বৎসর, যখন তাঁহার পিতা সম্রাট আরঙ্গজেব কর্ত্তৃক নির্দয়-রূপে নিহত হয়েন। বালক গোবিন্দ পার্ব্বত্য-প্রদেশে পলায়ন করিয়া শিক্ষা-লাভ করিতে লাগিলেন। কাল ক্রমে পার্শী হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অভিজ্ঞতা জন্মিল। ৩০ বৎসর বয়স হইতেই তিনি অদম্য-উৎসাহ প্রখর বুদ্ধি ও স্থির লক্ষ্যের সহিত সমগ্র বিচ্ছিন্ন শিখ-সমাজকে ঐক্যে আনিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। তিনি নিজে বীর ও অস্ত্রনিপুণ ছিলেন। পঞ্জাবে কিসে মুসলমান শক্তির ধ্বংস হয়, কিসে পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ সাধিত হয়, সেই দিকেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তাঁহাকে শিখ-গণ নেতৃত্বে স্বীকার করিল। কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে দুর্গাদেবীর পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদ ভিক্ষার জন্য গোবিন্দ নয়না-দেবীর পর্ব্বতে গমন করিলেন। গোবিন্দের ভক্তি ও ঐকান্তিকতা দৃষ্টে প্রসন্ন হইয়া, কথিত আছে, দেবী তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া নররক্ত চাহিলেন। গোবিন্দ মনুষ্য শোণিতে দেবীর প্রসন্নতা লাভ করিয়া শিখগণকে সামরিক জাতিতে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত হইলেন, ও সকলকে পাহুল বা দীক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। জলে শর্করা গুলিয়া তরবারির অগ্রভাগ দিয়া আলোড়িত করিয়া ঐ জল দীক্ষার্থীর দেহ-মস্তকে সিঞ্চন করিয়া ও কিয়দংশ তাহাকে পান করাইয়া জপজি হইতে অংশ বিশেষ পাঠান্তে দীক্ষা কার্য্য সমাধা হইত। দীক্ষান্তে গুরু-শিষ্য উভয়-কেই "ওয়া গুরুজি কি খালসা" "গুরু অর্থাৎ ঈশ্বরের খালসার জয় হউক" একথা সজোরে উচ্চারণ করিতে হইত। (খালসা শব্দের অর্থ ডাক্তার থ্রূপের মতে সাধারণ তন্ত্র (common wealth.)।

গুরু-গোবিন্দ প্রথমতঃ পাঁচ জনকে দীক্ষা দিয়া বলিলেন, এই পাঁচ জন মিলিয়া যে মণ্ডলী হইল, ইহার ভিতরে আমার আত্মা বিচরণ করিবে। তিনি দীক্ষা দিয়া নিজেকে দীক্ষিত হইবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন এবং নিজে দীক্ষিত হইয়া স্বয়ং সিং এই-উপাধি গ্রহণ করিলেন।

নানক-প্রবর্ত্তিত শিখ-ধর্ম্মকে নিজমতের অনুরূপ করিয়া লইবার জন্য এক্ষণে গুরু-গোবিন্দের প্রয়াস হইল। "আদি গ্রন্থ" এই সময়ে গুরু রামদাসের বংশাবলীর নিকট কর্ত্তারপুরেই থাকিত। গুরু-গোবিন্দ ঐ আদি-গ্রন্থ তাহাদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া নিজ-মত উহাতে সংযোজিত করিতে চাহিলে অদিগ্রন্থরক্ষকেরা কিছু-তেই সম্মত হইল না। অধিকন্তু যখন তাহারা বুঝিল যে নানক-প্রবর্ত্তিত-ধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতরে ইতর-লোক-সকলকে আনিবার চেষ্টা হইতেছে, তখন তাহারা গোবিন্দকে গুরু বলিয়া মানিতে অস্বীকার করিল। বলিল যদি গোবিন্দ গুরু হইতে চাহেন, তিনি স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-গ্রন্থ স্বয়ং রচনা করিতে পারেন। গোবিন্দ উপায়ান্তর না দেখিয়া গ্রন্থ-সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং নিজমত ১৬৯৬ খৃঃ অব্দে হিন্দী কবিগণের সাহায্যে শাস্ত্রাকারে প্রকাশ করিলেন। বাবা-নানকের প্রবর্ত্তিত মত বিপর্য্যস্ত বা পরিবর্ত্তিত করা গুরু-গোবিন্দের অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু শিখজাতিকে উত্তেজিত

করিয়া মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে এক সামরিক-জাতি গঠন করাই গুরু গোবিন্দের বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

গুরু-গোবিন্দের অনুচর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অচিরে খাঁগ্রা শৈলের রাজপুতগণ তাঁহাকে আনন্দপুরের নিকট আক্রমণ করিল। যুদ্ধে তাঁহার পুত্র অজিত সিং ও জোহার সিং নিহত হইলেন। দিল্লীর বাদসাহ-প্রেরিত সৈন্য আসিয়া গুরু গোবিন্দকে আনন্দপুর হইতে বিতাড়িত করিল এবং তাঁহার অবশিষ্ট পুত্রদ্বয়কে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া আরঙ্গজেবের আদেশ ক্রমে সিরহিন্দ নগরে মৃত্তিকাগর্ভে জীবন্ত প্রোথিত করিল। কিন্তু ধন্য গুরু গোবিন্দ! তিনি টলিবার নহেন। তিনি তখনও শতদ্রু নদীর দক্ষিণ-তীরে মরুভূমির মধ্যে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। ইহার পরে গোবিন্দ পাতিয়ালার অন্তর্গত টালবন্দীতে আসিয়া স্থিতি করিলেন, এবং হিন্দুদিগের বারাণসীতীর্থের ন্যায় টালবন্দীকে পবিত্র স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এই টালবন্দীতে অনেক প্রসিদ্ধ গুরুমুখী লেখকের আবির্ভাব হইয়াছিল। ভাটিণ্ডা ও আর একটি পবিত্র-স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

গুরু-গোবিন্দ এক্ষণে রাজা। তাঁহার কর্ম্মচারীগণ রাজস্ব আদায়ে বিব্রত। অনেক অলৌকিক-কার্য্য এক্ষণে তাঁহাতে আরোপিত। গোবিন্দসিং সিরহিন্দ দিয়া আনন্দপুরে চলিলেন। গোবিন্দের পুত্রদ্বয়ের নির্দ্দয় হত্যার বিষয় স্মরণ করিয়া তাঁহার অনুচরবর্গ সিরহিন্দ ধ্বংস করিতে মনস্থ করিলে গোবিন্দ সিং অনেক কষ্টে তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। তিনি ঐ নগরকে অভিসম্পাত দিয়া কহিলেন, যখনই তোমরা গঙ্গাস্নানে গমন বা তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, প্রত্যেকে ঐ নগর-প্রাচীরের দুইখানি ইষ্টক সতলজ বা যমুনা জলে নিক্ষেপ করিবে। পাদচারী যাত্রিগণ অদ্যাপিও গুরু-গোবিন্দের ঐ আদেশ পালন করিয়া থাকে।

কি কারণে বুঝা যায় না, গুরু-গোবিন্দ তাঁহার নিজ পূর্ব্ব আচরণের বিরুদ্ধে শেষ-জীবনে সম্রাট বাহাদুরসাহের অধীনে—মুসলমানেরই চাক্রী স্বীকার করিয়া,তাঁহারই নির্দ্দেশে জনৈক সেনানীরূপে দাক্ষিণাত্যে গমন করিলেন। ঐ খানেই তাঁহার জীবনে যবনিকা-পাত হইল। একজন আফগানকে তিনি ইতিপূর্ব্বে নিহত করিয়াছিলেন। তাহারই জনৈক আত্মীয়ের হস্তে ৪৮ বৎসর বয়সে ১৭০৮ অব্দে গোদাবরী তীরে নাদের নামক স্থানে অতর্কিতভাবে তিনি নিহত হইলেন। ঐ স্থান আবচাল নগর বলিয়া খ্যাত ও শিখ-তীর্থে পরিণত। আবচাল শব্দের অর্থ প্রস্থান বা তিরোভাব।

শিখদিগের নিকটে আদি-গ্রন্থ বেদের ন্যায় শ্রদ্ধেয়। কবিরপ্রমুখ অনেক ভক্তের উক্তি হইতে বাবা-নানক বহুল পরিমাণ সত্য-সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নানকের জীবনের ব্যাপক-কাল বৈরাগ্যে কাটিয়াছিল। গুরু-গোবিন্দের ভাব কতকটা রাজ্য ও রাজনীতির দিকে; কিন্তু নানকের দৃষ্টি ধর্ম্মের দিকে চরিত্রের উৎকর্ষতার দিকে ও একেশ্বরবাদের দিকে এবং ভ্রান্ত-সংস্কার ও বহুদেবতাপূজার প্রতিকূলে। বাবা-নানক প্রকৃত পক্ষে একজন উচ্চদরের সংস্কারক ছিলেন।

গুরুভক্তি দান ও নিরামিষ-ভোজনে অনুরাগ, এবং মিথ্যা-কথন ব্যাভিচার ক্রোধ লোভ স্বার্থপরতা ও অনাস্তিকতায় বিরাগ আদি-গ্রন্থের বিশেষত্ব। সন্ন্যাস ও গৃহত্যাগ নানকের মতে তাদৃশ ফলপ্রদ নহে; সংসারধর্ম্ম প্রতিপালনেই মহত্ত্ব। তাঁহার মতে বাহ্যিক

অনুষ্ঠানে ধর্ম্ম নাই, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম অন্তরে।

উদাসী ও অকালী নামধেয় বৈরাগী সম্প্রদায় শিখদিগের ভিতরে পরে আবির্ভূত হইয়াছিল। আদি-গ্রন্থ যদিও ব্রাহ্মণজাতির অভিমানের বড় অনুকূল ছিল না, তথাপি উহা জাতি-ত্যাগ সাক্ষাৎভাবে ঘোষণা করে নাই। জাতিনির্ব্বিশেষে তিনি সকলকেই ধর্ম্মে অধিকার দিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে নানক-ধর্ম্ম নিজ উচ্চ-আদর্শে ও জ্ঞানের আধিক্যে পৃথিবীর উন্নততম ধর্ম্ম সকলের ভিতরে স্থান পাইবার অধিকারী। নানকের নৈতিক জীবনে ও শিক্ষায় বুদ্ধদেবের ভাবের ছায়া পরিলক্ষিত হয়।

বাবা-নানক বলিতেন "ঈশ্বর এক, কাহাকে আর দ্বিতীয় বলিব; সকলের ভিতরেই অকলঙ্ক এক। হিন্দু ও মুসলমানের পন্থা দুই অর্থাৎ বিভিন্ন, কিন্তু ঈশ্বর এক। সেই এক ঈশ্বরকে ব্রহ্ম হরি রাম গোবিন্দ যাহাই বল, তিনি জ্ঞানের অতীত অদৃশ্য অকৃত ও অনন্ত। প্রকৃত সত্তা এক তাঁহারই। তিনি আদিকারণ, মনুষ্য ও জগৎ এই সকলই তাঁহা হইতে বাহির হইয়াছে। শূন্য হইতে জগতের সৃষ্টি নহে। তিনি আপনাকে অনন্ত ভাগে বিভক্ত করিয়া এই সমস্ত যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না। আদিগ্রন্থে আছে—

১। সেই এক সকলেতেই বিস্তারিত হইয়া সকলকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। যে দিকেই দেখি, দেখি তিনি।

মায়া-ভ্রমে সকলে বিভ্রান্ত। দুই একজনেই প্রকৃত-সত্য বুঝিতে পারে। সবই গোবিন্দ—সবই গোবিন্দ। গোবিন্দ ছাড়া আর কিছুই নাই। যেমন একটি সূত্র শতসহস্র (beads) দানার ভিতরে থাকে, তিনি তেমনি সকলেরই ভিতরে রহিয়াছেন।

২। জলের তরঙ্গ কখনই ফেনা বুদ্‌বুদ্ বিরহিত হইতে পারে না।

৩। এই যে জগৎ—ঈশ্বরেরই লীলা; তিনি ক্রীড়া করিতেছেন, তিনি অন্য হন না।

নানক বহুদেবদেবী পূজার বিরোধী হইলেও বলিতেন, ক্ষুদ্র দেবতারা সেই ভূমা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন। যাহাতে আর জন্মাইতে না হয়, তাহারই জন্য চেষ্টা কর। নানকের প্রচারিত বৈদান্তিক ভাবে ও গুরু-গোবিন্দের মতে সামান্য পার্থক্য আছে। বহু-ঈশ্বরবাদের দিকে গোবিন্দের একটু ঝোঁক ছিল। হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কতক পরিমাণে জাতিবর্ণ ঘুচাইয়া শিখগণকে লইয়া একটি স্বতন্ত্র মণ্ডলী মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে খাড়া করা গোবিন্দের লক্ষ্য ছিল। এই কারণে গুরু-গোবিন্দের উপর ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর বর্ণের বিরাগ পড়ে। গুরু-গোবিন্দ বলিতেন যুদ্ধে মৃত্যু মুক্তির নিদান। গুরু গোবিন্দ প্রত্যেক শিখকে পাঁচটি সামগ্রী আমরণ ধারণ করিতে আদেশ দেন। কেশ, কণ্ডা—ক্ষুদ্র তরবারি, কঙ্গা—কাষ্ঠের চিরুণী, কড়া—লৌহ-বলয়, কচ্—হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বিত পায়জামা। হিন্দুরা ধুতি পরিধান করে তামাকু সেবন করে, কিন্তু গোবিন্দ সিং শিখগণকে ধুতি-পরিধান ও তামাকু সেবন করিতে নিষেধ করিয়া দেন। ফলে শিখদের মধ্যে অনেকেই উত্তরকালে গাঁজা ও অহিফেনসেবী হইয়া দাঁড়ায়। তৎকালে প্রচলিত শিশু-কন্যা-হত্যা গোবিন্দ সিং নিষেধ করিয়া যান এবং বিবাহে পণ লইবার পক্ষেও তাঁহার নিষেধ ছিল। মুসলমান হইতে শিখগণকে পৃথক করিবার জন্য টুপির পরিবর্ত্তে পাকড়ী ব্যবহার করিবার তাঁহার আদেশ শিখগণের উপর

থাকে। এক আঘাতে ছিন্নমুণ্ড-ছাগাদির মাংস ভক্ষণে তাঁহার নিষেধ ছিল না। শিখগণের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর বিধায় তিনি ধর্ম্মযাজকের মুখে ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রবণের ব্যবস্থা রাখিয়া যান।

গুরু গোবিন্দের মত এই ভাবে চলিয়া আসিতেছে। নিতান্ত অধিক দিন নহে, রাওলপিণ্ডীর জনৈক উদাসী ফকির উহার সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার শিষ্য লুদিয়ানা জেলার রাম সিং পরে বিখ্যাত হইয়া উঠেন। তাঁহার শিষ্যগণ কুকা নামে পরিচিত। তাহাদের পরিচ্ছদে একটু বৈচিত্র আছে। ইঙ্গিতবাক্যে তাহারা পরস্পরকে চিনিয়া লয়। কতক পরিমাণে তাহাদিগকে রাজনৈতিক সম্প্রদায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহারা মধ্যে ব্রিটশ-শক্তিকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে ইংরাজের হস্তে দলপতিগণ নিহত ও বন্দীকৃত হয়েন। বর্ত্তমানে তাহারা ক্ষীণবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে শিখগণ হিন্দু আইন দ্বারা পরিচালিত। বিবাহ সম্বন্ধে একটু পার্থক্য আছে। শিখ-রমণীগণ বীর্য্যে ও রাজ্য পরিচালনে যে পুরুষগণ হইতে হীনতর নহেন, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ ধর্ম্মে স্বামী মৃত হইলে দেবরের সহিত বিবাহেরও ব্যবস্থা আছে; ইহাকে "চাদর দালনা" অর্থাৎ চাদর দেওয়া বলে। কিন্তু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-শিখগণের ভিতরে ঐরূপ বিবাহের পরিচয় বড় মিলে না। সতীদাহও শিখগণের মধ্যে অপরিচিত নহে। কিন্তু বৃটিশ-শাসনে এক্ষণে উহা নিষিদ্ধ। দায়াধিকার সম্বন্ধেও শিখদিগের একটু বৈচিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। *

---

* Rulers of India,
Ranjit Sing by Sir Lepel Griffin, K. C. S. I.

নানা-কথা।

ধর্ম্মে উদারতা।—রাজা রণজিত সিংহের অমাত্যগণের মধ্যে ফকির আজিজুদ্দীনের (Azizuddin) নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তিনি রণজিতের (Foreign Minister) পররাষ্ট্র-বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহাকে সৈন্যের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিতে হইত। আজিজুদ্দীনের মূল্যবান পরামর্শে রণজিত অনেক সময়ে পরিচালিত হইতেন। দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যে আজিজুদ্দীনেরই আধিকার ছিল। লর্ড বেণ্টিক, লর্ড আকলণ্ড, লর্ড এলিনবরা এবং কাবুলের দোস্ত মাহম্মদের নিকট দৌত্যকার্য্যে আজিজুদ্দীন আপন প্রতিভার বিশেষ পরিচয় দেন। মুসলমান হইলেও রণজিত তাঁহার উপর বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহাকে নানাবিধ উপহার দিয়া তাঁহার গুণের সম্বর্দ্ধনা করিতেন। ধর্ম্ম-বিষয়ে আজিজুদ্দীন সুফী ছিলেন। সকল ধর্ম্মের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। সাধারণ মুসলমানের দৃষ্টিতে তিনি ধর্ম্মহীন হইলেও অন্যান্য সুফীগণের ন্যায় তাঁহার হৃদয় উদার ও সরস ছিল। একদিন রণজিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্মটি তোমার ভাল লাগে। আজিজুদ্দীন উত্তরে বলিলেন "মহারাজ আমি এখন সুবিস্তীর্ণ নদীর মাঝখানে ভাসিতেছি, দুই পাশের উপকূলের দিকে চাহিয়া দেখিতেছি, কিন্তু কোন পার্থক্য খুঁজিয়া পাইতেছি না"। রণজিত স্তব্ধ হইয়া গেলেন। বাস্তবিকই যখনই কোন সাধক ধর্ম্মের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করেন, সম্প্রদায় গত ক্ষুদ্র মতভেদ তাঁহাকে নিজগণ্ডীর ভিতরে ধরিয়া রাখিতে পারে না। আজিজুদ্দীন সুবক্তা ও সুলেখক ছিলেন। তিনি লাহোরে নিজঅর্থে পারস্য ও আরব্য-ভাষা শিক্ষার জন্য এক কালেজ সংস্থাপন করেন। কবি বলিয়া আজিজুদ্দীনের প্রতিষ্ঠা আছে। তাঁহার রচিত কবিতা হইতে কয়েক পংক্তির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"স্থির-দৃষ্টিতে পৃথিবীকে নিরীক্ষণ কর, বুঝিবে ছায়ার ন্যায় ইহা চঞ্চল। বৃথা বাসনা লইয়া কেন অস্থির হইতেছ, যখন পূর্ণ করিবার তোমার শক্তি নাই। আপনাকে ভোল; ঈশ্বরের উপর তোমার কার্য্য সমর্পণ কর। তাঁহাকে সকল হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস কর। শান্ত হইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রতীক্ষা কর। যাহা কিছু পাইয়াছ, তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দাও। সংসারের কোলাহল তোমার কর্ণকে যেন বধির না করে। তাঁহাতেই উৎফুল্ল হও। আশ্বস্ত হও, তিনি তোমাকে রক্ষা করিবেনই। আমি আছি বলিতে চাও, কি মূর্খতায়

হইতে পারে, তুমি একজন মহাবীর। কিন্তু তোমার স্থায়ীত্ব কি জলবুদ্বুদের ন্যায় নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী নহে? তোমার চিন্তা তোমার কল্পনা, হায়, উর্ণনাভের জালের ন্যায় নিতান্ত ক্ষীণ ও অস্থির। আমি এই মাত্র বুঝি ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সকলই নির্ভর করিতেছে"।

আশ্বাস বাণী। আগামী বৎসরের জন্য ভারতের বার্ষিক-আয়ব্যয়-নির্দ্ধারণ সভায় লর্ড মিণ্টো আপন বক্তৃতায় বিশেষ সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ভারতবাসিগণের অন্তরে বর্ত্তমানে যে নব ও সঙ্গত উচ্চ-আকাঙ্ক্ষা স্থান পাইতেছে, তাহা প্রতীতি করিয়া উহার পূরণকল্পে গবর্ণমেণ্টকে প্রস্তুত হইতে হইবে। তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে ভারতবর্ষ এক্ষণে ঘোর পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছে। ইতি মধ্যে লবণের শুল্ক ও ডাকমাশুল হ্রাসে এবং ভবিষ্যতে বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা-বিধানের আশ্বাসদানে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করিতেছেন। চীনদেশীয়গণ অহিফেনকবল হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, কার্য্যে পরিণত হইলে তাহাতে ভারতের রাজস্ব-বিভাগের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিলেও মিণ্টোর সহানুভূতি চীনের দিকে পড়িয়াছে। হায়! স্বার্থজলাঞ্জলি দিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার সৎ-সাহস কয়জনার কুলায়।

পুনরুত্থান। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান স্মরণে রাখিবার জন্য ইষ্টার পর্ব্বের প্রবর্ত্তনা। ক্রুশে খ্রীষ্টের মৃত্যু হইলে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। কিন্তু মৃত্যুর তৃতীয় দিবসেই কবর হইতে তিনি সশরীরে স্বর্গ-ধামে প্রয়াণ করেন। ইহার ভিতরে অন্ততঃ এই টুকু সত্য উপলব্ধি করিতে হইবে যে মানবাত্মার বিনাশ নাই। মৃত-দেহকে সমাহিত বা অগ্নিসাৎ কর, অমর-আত্মা পাপপুণ্যের ফলাফল লইয়া উন্নত-লোকে গমন করিবেই। যাঁহারা আপনার জীবন দিয়া—প্রতি রক্ত-বিন্দু দান করিয়া অচল ও অটলভাবে ঈশ্বরের পথ—ধর্ম্মের পথ প্রদর্শন করিলেন, অমৃত লোকের—অনন্ত স্বর্গধামের অভয়-দ্বার যে তাঁহাদের সম্মুখে চির প্রমুক্ত, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি!

পরমাণুতত্ত্ব। পরমাণুগণ বস্তুমাত্রেরই যে অবিভাজ্য চরম-অংশ, এ ধারণা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে বড় আর স্থান পাইতেছে না। বিখ্যাত প্রফেসর ল্যা-সন বলেন যাহাকে আমরা জড়বস্তু বলি, তাহার অতি-সূক্ষ্ম প্রতি কণিকার ভিতরে এত শক্তি (energy) রহিয়াছে, যে তাহারা বাহির হইতে শক্তি না পাইলেও আপনা হইতে বর্দ্ধিত হইতে পারে। যখন কোন বড় জড়বস্তু কোন কারণে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, তখন তাহার পরমাণুর এই অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ দেখা যায়। সূর্য্যের তেজ, তাড়িত এই ভাবেই উদ্ভূত। জড়বস্তু (matter) ও শক্তি (force) একই পদার্থের দুই বিভিন্ন মূর্ত্তি। যখন পরমাণুগত শক্তি (intra atomic energy) অচল ভাবে বিরাজমান, তখন তাহা জড়পদার্থ; যখন তাহা সচল ভাবে বিরাজমান, তখন তাহা তেজ আলোক তাড়িত ইত্যাদি।

বিজ্ঞান-বার্ত্তা। তারবিহীন টেলিগ্রাফের অত্যাশ্চর্য্য শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ডানিশ আবিষ্কারক পাউলসেন তারের বিনা সাহায্যে ইউরোপ হইতে আমেরিকায় সংবাদ প্রেরণের অত্যাশ্চর্য্য কৌশল বাহির করিয়াছেন। আগামী ছয় মাসের ভিতরে কার্য্য চলিবে এইরূপ আশাও দিয়াছেন।

শত-বর্ষী। ইয়র্কসায়ার হেরাল্ডে প্রকাশ যে লণ্ডনের নিকট ব্রিক্সটন নগরবাসী রিচার্ড রাইমার নামক ধর্ম্মযাজক ১৮০৯।২৫ এ ফেব্রুয়ারিতে জন্মগ্রহণ করিয়া এখনও জীবিত রহিয়াছেন। ধর্ম্মযাজকগণের মধ্যে তিনিই স্থবিরতম চলিয়া অনুমিত। এদেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণও সাত্ত্বিক আহারপ্রযুক্ত প্রায়ই সবল সুস্থকায় ও দীর্ঘজীবী।

সম্মিলন। বিগত ৯ই মার্চ্চ তারিখে খ্রিষ্টিয়ান লাইট নামক সংবাদ পত্র বিলাতের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্নসম্প্রদায়ের সম্মিলন সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে উদারতার কাল আসিয়া পড়িয়াছে। অনেক সময়ে আমাদের বলবীর্য্য—শক্তি-সামর্থের বহুঅংশ দল আঁটিতে ও নিজ সংস্কার পোষণার্থ যুক্তি-তর্ক উদ্ভাবনে অপব্যয়িত হয়; শান্ত-স্বরূপ ঈশ্বরের অর্চনা করিতে গিয়া অনেক সময়ে অশান্তি ক্রয় করিয়া আনি; ধর্ম্মজগতে আপনাকে প্রচার করিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হই না। হৃদয়ের বিশালতা ও ধর্ম্মমতের উদারতা এই সকল মহাব্যাধির একমাত্র মহৌষধ। লোকে নিজের মত লইয়া এতই উন্মত্ত, যে সে অপরের মত স্থির-বুদ্ধিতে বুঝিবার বা নিজমত অপরকে বুঝাইবার সহিষ্ণুতা একেবারেই হারাইয়াছে। হায়! ঈশ্বরের নিকট সে আলোক ভিক্ষা করে না। নিজের নিষ্প্রভ আলোকে সে এমনই ঘোর অন্ধকার রচনা করে, যে সে নিজে পথ খুঁজিয়া পায় না।

ব্রাহ্ম-সমাজ। ব্রাহ্মসমাজ মুষ্টিমেয় লোকের সংহতি হইতে পারেন, কিন্তু অনুবর্ত্তী লোকসংখ্যা সত্যের পরিমাপক নহে। জগতে জ্ঞানী ও পণ্ডিতের সংখ্যা অতিবিরল। তাই বলিয়া জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য

উড়াইয়া দিবার সামগ্রী নহে। হইতে পারে, ব্রাহ্মসমাজ তাহার বক্তব্য বিষয় সাধারণের উপযোগী করিয়া বলিতে বা লোকান্তরে প্রচার করিয়া তুলিতে পারিতেছেন না। কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইবার কারণ নাই। সত্য জয় যুক্ত হইবেই, এই স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস যেন আমরা জীবনের কোন মুহূর্ত্তে হারাইয়া না ফেলি। হায়! সত্যের বক্তা ও ধারয়িতা উভয়ই জগতে নিতান্ত দুর্লভ।

হাইকোর্টের বিচারপতি চন্দভার্কার। কনগ্রেস উপলক্ষে আহূত সেদিনকার ধর্ম্মসম্মিলনীতে চন্দভার্কার ঠিকই বলিয়াছেন, যে "ব্রাহ্মসমাজের উপরে সমস্ত ভারতের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে"। বস্তুতঃ ভারতে এতগুলি ধর্ম্মমত প্রচলিত রহিয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম যেন আর একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্ম হইয়া না দাঁড়ায়। আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে, যে সকল-জাতি সকল-ধর্ম্মকে আপনার বিশাল ব্যাপকতার মধ্যে আনিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়। একমেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, সকলকে এক করিয়া লও। সদয়ভাবে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি নিরীক্ষণ কর। যাঁহারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী, অন্যান্য বিষয়ে সামান্য দুর্ব্বলতা থাকিলেও তাহাদিগকে আপনার উদার ক্রোড়ের ভিতর গ্রহণ কর। গণ্ডী দিয়া কাহাকেও বাহিরে রাখিও না। কেবলমাত্র উন্নত-মত-পোষণের ভাণ করিলে ভাবী জাতীয় সৌভাগ্যের পত্তন হয় না। কিন্তু আপনার চারিত্রে ও কার্য্যে যতদিন না জগৎকে স্তম্ভিত করিতে পারিবে, তত দিন আশানুরূপ ফল লাভের প্রত্যাশা কোথায়? উদ্‌গ্রীব হইয়া শ্রবণ কর, পরস্পরের প্রতি সদয়ভাব রক্ষা করিয়া সমবেতচেষ্টায় আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও দেশের মঙ্গলসাধন করিবার জন্য প্রতিমুহূর্ত্তে আহ্বান আসিতেছে।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৭, পৌষ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪১০৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৪৩২।৵৩
সমষ্টি	...	২৮৪২॥৵৩
ব্যয়	...	৪৪৬৸৵৯
স্থিত	...	২৩৯৫॥৶৬

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
পাঁচকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৩০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
৯৫॥৶৬

২৩৯৫॥৶৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ৩০৪৲

মাসিক দান।

স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের এষ্টেটের এক্‌জীকিউটার মহাশয়গণ
২০০৲

কোম্পানীর কাগজ ক্রয়
১০০৲

মাঘোৎসবের দান।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত
২৲

শ্রীযুক্ত হরকুমার সরকার
২৲

৩০৪৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২১৸৵০
পুস্তকালয়	...	।৶০
যন্ত্রালয়	...	৭৯।৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৸০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৩৸০
সমষ্টি	...	৪১০৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৯৬৸৵৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৮৸৬
পুস্তকালয়	...	৸০
যন্ত্রালয়	...	৮১।৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৩৯৲
সমষ্টি	...	৪৪৬৸৵৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

সপ্তদশ কল্প
প্রথম ভাগ।
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭৮।

৭৬৮ সংখ্যা

১৮২১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

সুন্দর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অনুবৃত্তি।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের মধ্যে,—বর্ণ, ধ্বনি, আকার, গতি এই সমস্তই সৌন্দর্য্য-রস উদ্বোধনে সমর্থ। সকারণেই হউক, অকারণেই হউক—এই জাতীয় সৌন্দর্য্য, ভৌতিক-সৌন্দর্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়-জগৎ হইতে যদি আমরা আধ্যাত্মিক জগতে, সত্যের জগতে, বিজ্ঞানের জগতে আরোহণ করি, সেখানে অপেক্ষাকৃত একটু কঠোর ভাবের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইব, যদিও সে সৌন্দর্য্য-বাস্তবতায় কিছুমাত্র ন্যূন নহে। যে সকল সার্ব্বভৌমিক নিয়মে জড়পিণ্ডসমূহ নিয়মিত হয়, যে সকল নিয়মে জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন জীবসমূহ পরিশাসিত হয়, সুদীর্ঘ সিদ্ধান্তের মধ্যে যে সকল মূলসূত্র বিদ্যমান, এবং যে সকল মূলসূত্র হইতে সিদ্ধান্তসমূহ উৎপন্ন হয়, গুণী, কবি, ও দর্শনবেত্তার যে প্রতিভা নূতন জিনিসের সৃষ্টি করে,—তৎসমস্তই সুন্দর, প্রকৃতির মতই সুন্দর। ইহাকে তাত্ত্বিক সৌন্দর্য্য বলে।

পরিশেষে, যদি আমরা নৈতিক-জগৎ ও উহার নিয়মাদির আলোচনা করি,—স্বাধীনতা, সাধুতা, সেবানিষ্ঠার আলোচনা করি,—অ্যারিস্টাইডিসের ন্যায়পরতা, লিওনিডাসের বীরত্ব, দানবীর ও স্বদেশনিষ্ঠ মহাত্মাদিগের কথা আলোচনা করি—এই সমস্তের মধ্যে আমরা তৃতীয় জাতীয় সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিব; এই সৌন্দর্য্য অপর দুই জাতীয় সৌন্দর্য্যকেও অতিক্রম করে; ইহা নৈতিক সৌন্দর্য্য।

এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই, এই সমস্তের মধ্যেও সুন্দর ও মহানের ভেদ আছে। অতএব, কি প্রকৃতি-রাজ্যে, কি মনোরাজ্যে, কি জ্ঞানে, কি ভাবে, কি কার্য্যে, সুন্দর ও মহান সকলের মধ্যেই বিদ্যমান। সৌন্দর্য্যের মধ্যে কি অসীম বৈচিত্র্য!

এই সমস্ত ভেদ নির্ণয় করিবার পর, উহাদের সংখ্যা কি আমরা কমাইয়া আনিতে পারি না? এই সমস্ত বৈষম্য অকাট্য হইলেও উহার মধ্যে কি সাম্য নাই,

একটি মূল-সৌন্দর্য্য নাই—এই বিশেষ-বিশেষ সৌন্দর্য্য যাহার ছায়া, যাহার আভা, যাহার উচ্চনীচ ধাপ মাত্র ?

Plotin তাঁহার "সুন্দর"-সম্বন্ধীয় সন্দর্ভে, এই প্রশ্নটিই উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন:—সুন্দর জিনিস্‌টা স্বরূপতঃ কি ? এই আকারটি সুন্দর, কিংবা ঐ আকারটি সুন্দর,—এই কার্য্যটি সুন্দর, কিংবা ঐ কার্য্যটি সুন্দর বলিয়া আমরা উপলব্ধি করি; কিন্তু বিভিন্ন হইয়া এই দুই পদার্থই কি করিয়া সুন্দর হইল ? এ দুয়ের মধ্যে সাধারণ গুণটি কি যাহার দরুণ উভয়ই সুন্দর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ?

এই প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে, সৌন্দর্য্যের সমস্যাটি আমাদের নিকট গোলকধাঁধার মত থাকিয়া যায়—উহা হইতে বাহির হইবার কোন পথ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন বস্তুর একই নাম দেওয়া হইতেছে, অথচ, যাহার বলে উহাদিগকে একই নামে অভিহিত করা হয় সেই বাস্তবিক ঐক্যস্থলটি কোথায় তাহা আমরা অবগত নহি।

অথবা, সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে সকল বৈষম্য আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি সে এরূপ বৈষম্য যে তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার যোগ-সূত্র আবিষ্কার করা অসম্ভব; অথবা এই সকল বৈষম্য শুধু বাহ্যিক, উহাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের ভাব—একটা একতার ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

যদি কেহ বলেন এই একতা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক, তাহা হইলে এ কথাও বলিতে হয় যে, ভৌতিক সৌন্দর্য্য তাত্ত্বিক সৌন্দর্য্য ও নৈতিক সৌন্দর্য্য—ইহাদের পরস্পারের মধ্যে কোন সম্বন্ধই নাই। তাহা হইলে, কলা-গুণী কিরূপে কাজ করিবেন ? তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্য্য বিরাজ করিতেছে—কিন্তু তাহার মধ্য হইতে একটিমাত্র রচনার বিষয় তাঁহাকে বাছিয়া লইতে হইবে; কেন না, ইহাই কলাশাস্ত্রের নিয়ম। এই নিয়মটি যদি কৃত্রিম হয়, যদি প্রকৃতির মধ্যে প্রত্যেক সৌন্দর্য্যই স্বরূপত বিভিন্ন হয়, তাহা হইলে কলা-শাস্ত্র আমাদিগকে ভুল শিক্ষা দিয়া থাকেন—তাঁহার কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কিরূপে একটা মিথ্যা কথা শিল্পশাস্ত্রের নিয়ম হইল, আমি তাহা জানিতে চাই। তাহা হইতেই পারে না। শিল্পকলার মধ্যে এই যে একটি একতার ভাব পরিব্যক্ত হয়, ইহার একটু আভাস প্রকৃতির মধ্যে না পাইলে, কলাগুণীরা কখনই উহা তাঁহাদের রচনার মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতেন না।

সুন্দর ও মহানের ভেদ এবং অন্যান্য ভেদ যাহা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি, সেই সকল ভেদ আমি প্রত্যাহার করিতেছি না; কিন্তু সেই সকল ভেদের মধ্যে কিরূপে একটা মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়, এক্ষণে তাহাই দেখা আবশ্যক। এই সকল ভেদ ও অভেদ পরস্পর-বিরোধী নহে। একতা ও বিচিত্রতা যেমন সত্যের তেমনি সৌন্দর্য্যেরও একটা প্রধান নিয়ম। সমস্তই এক ও সমস্তই বিচিত্র। আমরা সৌন্দর্য্যকে তিনটি বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। ভৌতিক সৌন্দর্য্য, তাত্ত্বিক সৌন্দর্য্য, ও নৈতিক সৌন্দর্য্য। এক্ষণে এই তিন সৌন্দর্য্যের মধ্যে ঐক্যস্থল কোথায় তাহাই অন্বেষণ করিতে হইবে। আমাদের মনে হয়, এই তিন সৌন্দর্য্য আসলে একই এবং নৈতিক সৌন্দর্য্য, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যেরই অন্তর্গত।

এই মতটি দৃষ্টান্তের দ্বারা সপ্রমাণ করা যাউক।

যাহাকে ভেল্‌ভেডিয়ারের অ্যাপলো

বলে, সেই অ্যাপোলো-মূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া একবার দাঁড়াও, এবং সেই উৎকৃষ্ট কলারচনার মধ্যে কোন্ অংশটি বিশেষরূপে তোমার নেত্রকে আকর্ষণ করে তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। যিনি দার্শনিক নহেন, যিনি শুধু একজন পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত, কোন বিশেষ পদ্ধতির পক্ষপাতী না হইয়াও কলা-সম্বন্ধে যাঁহার সুরুচি ছিল, সেই Winkleman এই প্রসিদ্ধ Apollo মূর্ত্তিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার সমালোচনা অতীব কৌতূহলজনক। উহার সুন্দর দেহের উপর অমর যৌবনশ্রী ফুটিয়া রহিয়াছে, সচরাচর মানবশরীর অপেক্ষা একটু অধিক উচ্চ, তাহার সমস্ত অঙ্গভঙ্গীতে রাজমহিমা পরিব্যক্ত—এই সমস্ত মিলিয়া তাহা হইতে যে দেবত্বের লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে Winkleman সর্ব্বাগ্রে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ ললাট দেবতারই উপযুক্ত, উহাতে অচলা শান্তি বিরাজমান। আর একটু অধোভাগে মানবত্বের লক্ষণ আবার দেখা দিয়াছে; এবং এইরূপ মানবীয় লক্ষণ থাকাতেই এই সকল কলা-রচনার প্রতি মানব-চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃষ্টিতে তৃপ্তির ভাব, নাসারন্ধ্র ঈষৎ বিস্ফারিত, নীচের ঠোঁট্ একটু তোলা;—এই সমস্ত লক্ষণে বিজয়গর্ব্ব এবং বিজয়সাধনের শ্রান্তি প্রকাশ পাইতেছে। এই সমালোচকের প্রত্যেক কথাটি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ; দেখিবে তাহাতে একটা নৈতিক ভাবের ছাপ রহিয়াছে। এই পুরাতত্ত্ব পণ্ডিত এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছেন এবং তাঁহার তত্ত্ববিশ্লেষণ ক্রমে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য-ভক্তের ভক্তি-বন্দনায় পরিণত হইয়াছে।

প্রতিমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে, এখন একজন আসল মানুষকে—একজন জীবন্ত মানুষকে নিরীক্ষণ কর। মনে কর সুখসম্পদের নিকট কর্ত্তব্যকে বলিদান দিবার জন্য কোন ব্যক্তির বলবৎ প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও সে বীরের ন্যায় সংগ্রাম করিয়া নীচ স্বার্থের উপর জয়লাভ করিল এবং ধর্ম্মের জন্য সুখসম্পদকে বিসর্জ্জন করিল। যখন সে এই মহৎ সঙ্কল্পটি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল, সেই সময়ে যদি তাহাকে দেখিতে তাহার মূর্ত্তিটি তোমার নিকট নিশ্চয়ই অতি সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইত। কেননা, সেই মূর্ত্তিতে তাঁহার আত্মার সৌন্দর্য্য পরিব্যক্ত। হয় ত আর কোন অবস্থায় তাঁহার মূর্ত্তি সাধারণ মানব-মূর্ত্তির মতই মনে হইবে--এমন কি, তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে; কিন্তু এইস্থলে, আত্মার আলোকে আলোকিত হওয়ায় উহা হইতে একটা স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যজ্যোতি উদ্ভাসিত হইতেছে। এইরূপ, সক্রেটিসের স্বাভাবিক আকৃতির সহিত গ্রীক-সৌন্দর্য্যের আদর্শ-মূর্ত্তির তুলনা করিয়া দেখ,—উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ; মৃত্যুশয্যায় শয়ান সক্রেটিস্‌কে দেখ—যখন তিনি বিষ পান করিয়া তাঁহার শিষ্যদের সহিত আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন—তাঁহার সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া তুমি মুগ্ধ হইবে।

মৃত্যুকালে, সক্রেটিস্ নৈতিক মাহাত্ম্যের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। তোমার নেত্রসমক্ষে শুধু তাঁহার মৃত কলেবরটি রহিয়াছে। যতক্ষণ তাঁহার মৃতদেহে আত্মার কিছু চিহ্ন ছিল, ততক্ষণই উহাতে সৌন্দর্য্যও রক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু ক্রমশ যখন সেই ভাবটি চলিয়া গেল, তখন দেহ আবার পূর্ব্ববৎ গ্রাম্য ও কুৎসিৎ হইয়া পড়িল। মৃতব্যক্তির

মুখমণ্ডলে হয় বীভৎস ভাব, নয় স্বর্গীয় ভাব প্রকাশ পায়।

আত্মা যখন ভৌতিক দেহকে আর ধরিয়া রাখে না, যখন দেহ হইতে পঞ্চভূত বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, তখনই সেই মৃতদেহ কুৎসিৎ আকার ধারণ করে; যখন উহা আমাদের মনে অনন্তের ভাব উদ্বোধিত করে, তখনই উহা স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে।

মানুষের অচল মূর্ত্তি একবার আলোচনা করিয়া দেখ; ইতর প্রাণী অপেক্ষা মানুষের মূর্ত্তি সুন্দর, আবার সমস্ত নির্জীব পদার্থ অপেক্ষা ইতর প্রাণীর মূর্ত্তি সুন্দর। তাহার কারণ, ধর্ম্ম ও প্রতিভার অসদ্ভাব হইলেও, মনুষ্য-মূর্ত্তিতে জ্ঞান ও নীতির ভাব নিয়ত প্রকাশ পায়; ইতর প্রাণীর মূর্ত্তিতে অন্ততঃ হৃদয়ের ভাব প্রকাশ পায়; পূর্ণমাত্রায় না হউক অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও আত্মার ভাব প্রকাশ পায়। যদি আমরা প্রাণীজগৎ হইতে নিরবচ্ছিন্ন ভৌতিক জগতে অবতরণ করি,—যতক্ষণ তাহাতে আমরা জ্ঞানের লেশমাত্র ছায়া উপলব্ধি করি, যতক্ষণ উহা আমাদের মনে, কি জানি কেন, কোন প্রকার চিন্তা ও ভাবের উদ্রেক করে, ততক্ষণই তাহাতে আমরা সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। যদি কোন জড়-পদার্থ, কোন প্রকার ভাব কিংবা ভাবার্থ প্রকাশ না করে, তখন আর তাহাতে আমরা কোন সৌন্দর্য্যে দেখিতে পাই না। কিন্তু সত্তা মাত্রই সজীব। ভৌতিক পদার্থ মূক হইলেও অভৌতিক শক্তিসমূহে তাহা ওতপ্রোত; এবং উহা যে সকল নিয়মের অধীন তাহা সর্ব্বত্রবিদ্যমান জ্ঞানেরই সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। মৃত জড় পদার্থে, সূক্ষ্মতম রসায়নিক বিশ্লেষণ কখনই প্রযুক্ত হইতে পারে না; কিন্তু যাহারই কোন প্রকার দেহযন্ত্র আছে, এবং যাহা-কিছু শক্তি হইতে ও নিয়ম হইতে বঞ্চিত নহে, তাহাতেই ঐরূপ বিশ্লেষণক্রিয়া সম্ভব। কি গভীর সাগর-গর্ভে, কি উচ্চ আকাশ-তলে, কি বালুকণার মধ্যে, কি প্রকাণ্ড পর্ব্বত-শিখরে,—উহাদের স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া, ভূমা-আত্মার অমৃত কিরণ সর্ব্বত্রই বিচ্ছুরিত হইতেছে। চর্ম্ম-চক্ষুর ন্যায় আত্মার চক্ষু দিয়া প্রকৃতি-রাজ্যকে দর্শন কর,—সর্ব্বত্রই নৈতিক ভাব তোমার চোখে পড়িবে, এবং প্রত্যেক পদার্থের রূপ আমাদের চিন্তারই প্রতিরূপ বলিয়া উপলব্ধি হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কি মনুষ্য-মূর্ত্তি, কি ইতর প্রাণীর মূর্ত্তি, ভাবপ্রকাশেই উহাকে সুন্দর দেখায়। কিন্তু যখন তুমি উত্তুঙ্গ হিমালয়-শিখরে আরোহণ কর, কিংবা অসীম সমুদ্রের সম্মুখে অবস্থান কর, যখন তুমি সূর্য্যের উদয়াস্ত, আলোকের জন্ম মৃত্যু নিরীক্ষণ কর—এই সমস্ত আশ্চর্য্য গম্ভীর দৃশ্য তোমার উপর কি কোন নৈতিক প্রভাব প্রকটিত করে না? এই সকল মহান দৃশ্য অবশ্যই কোন এক পরাশক্তির অভিব্যক্তি, পরমাশ্চর্য্য পরম জ্ঞানের অভিব্যক্তি—এইরূপ কি তোমার মনে হয় না? এবং তখন মানুষের মুখের মত, প্রকৃতির মুখেও কি তুমি এক প্রকার ভাবের প্রকাশ দেখিতে পাও না?

কোন আকৃতিই একক থাকিতে পারে না, উহা কোন-না-কোন পদার্থের আকার। অতএব ভৌতিক সৌন্দর্য্য কোন এক আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যেরই নিদর্শন। উহাই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সৌন্দর্য্য; এবং উহাই সৌন্দর্য্যের ভিত্তি, সৌন্দর্য্যের মূল-তত্ত্ব, সৌন্দর্য্যের ঐক্যসূত্র।

আমরা সৌন্দর্য্যের যত প্রকার ভেদের উল্লেখ করিয়াছি, তৎসমস্তই বাস্তব

সৌন্দর্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই বাস্তব সৌন্দর্য্যের উপরে আর এক শ্রেণীর সৌন্দর্য্য আছে—সেটি মনের আদর্শ-সৌন্দর্য্য। এই আদর্শ সৌন্দর্য্য,কোন ব্যক্তি বিশেষে কিংবা ব্যক্তিসমূহের মধ্যে অবস্থিতি করে না। এইরূপ সৌন্দর্য্যের ধারণা মনে আনিবার জন্য, বাহ্যপ্রকৃতি কিংবা আমাদের বহুদর্শিতা শুধু এক-একটা উপলক্ষ যোগাইয়া দেয় মাত্র; কিন্তু আসলে এই সৌন্দর্য্য স্বতন্ত্র শ্রেণীর। এই প্রকার সৌন্দর্য্যের ধারণা মনে একবার প্রকাশ পাইলে, কোন প্রাকৃতিক মূর্ত্তি যতই সুন্দর হউক না কেন,—উহা ঐ পরম সৌন্দর্য্যেরই একটা নকল বলিয়া মনে হয়; উহা কিছুতেই ঐ সৌন্দর্য্যের সমান হইতে পারে না। কোন একটা সুন্দর কাজের কথা আমার নিকট বল, আমি উহা অপেক্ষাও সুন্দরতর কাজ মনে কল্পনা করিতে পারি। এমন যে অ্যাপলো মূর্ত্তি তাহারও অনেক দোষদর্শী সমালোচক আছে। আদর্শের দিকে যতই অগ্রসর হও, আদর্শটি ততই যেন পিছাইয়া যায়। আদর্শ-সৌন্দর্য্যের চরম অংশটি অনন্তের মধ্যে—অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিত; কিংবা আরও ভাল করিয়া বলিতে গেলে, সেই ধ্রুব আদর্শটি, পূর্ণ আদর্শটি, স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যেহেতু ঈশ্বর সকল পদার্থেরই মূলতত্ত্ব, অতএব সেই অধিকারসূত্রে তিনি পূর্ণ সৌন্দর্য্যেরও মূলতত্ত্ব; সুতরাং নূন্যাধিক অপূর্ণভাবে যাহা কিছু সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে, সেই সমস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেরও তিনি মূলতত্ত্ব; তিনি যেমন ভৌতিক জগতের স্রষ্টা, তাত্ত্বিক-জগৎ ও নৈতিক-জগতের পিতা, তেমনি তিনি সকল সৌন্দর্য্যের মূলাধার।

গতি, আকার, ধ্বনি, বর্ণ প্রভৃতির বিচিত্র সম্মিলন ও সুমিশ্রনে এই দৃশ্যমান জগতে যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা এত মুগ্ধ হই; আর এই সুব্যবস্থিত বিরাট দৃশ্যের পশ্চাতে, যে নিয়ন্তা, যে বিধাতা, যে বিশ্বকর্ম্মা মহাশিল্পী রহিয়াছেন, তাঁহাকে কি আমরা উপলব্ধি করিব না?

ভৌতিক সৌন্দর্য্য নৈতিক সৌন্দর্য্যেরই এক প্রকার আচ্ছাদন।

এই সত্য-জ্যোতি, এই তাত্ত্বিক সৌন্দর্য্য,—ইহার মূলতত্ত্বটি কি? সকল সত্যের যে মূলতত্ত্ব, ইহারও সেই মূলতত্ত্ব।

নৈতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে, দুইটি স্বতন্ত্র উপাদান বিদ্যমান,—উভয়ই সুন্দর, কিন্তু বিভিন্নভাবে সুন্দর। যথা:—ন্যায়পরতা ও উদারতা, প্রেম ও ভক্তি। যে ব্যক্তি স্বকীয় আচরণে ন্যায়পরতা ও উদারতা প্রকাশ করে, তাহার সম্পাদিত কার্য্য যার পর নাই সুন্দর। কিন্তু যিনি ন্যায়ের মূলাধাব, প্রেমের অফুরন্ত উৎস, তাঁহার সৌন্দর্য্য কি বলিয়া বর্ণনা করিবে? আমাদের নৈতিক প্রকৃতি যদি সুন্দর হয়, যিনি এই নৈতিক প্রকৃতির স্রষ্টা তিনি কত না সুন্দর! তাঁহার ন্যায়, তাঁহার করুণা, আমাদের অন্তরে, আমাদের বাহিরে,—সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। তাঁহার ন্যায়ব্যবস্থাই জগতের এই নৈতিক ব্যবস্থা; কোন মানব-বিধি তাহা রচনা করে নাই; প্রত্যুত মনুষ্য-রচিত বিধি-ব্যবস্থাদি চিরকাল সেই ন্যায়-কেই ব্যক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছে; এবং সেই ন্যায় নিজ বলেই এতাবৎকাল এই জগতে সংরক্ষিত হইয়াছে,স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। নিজের অন্তরে যদি অবতরণ করি, আমাদের অন্তরাত্মাই সাক্ষ্য দিবে যে, ধর্ম্মের সহচর যে শান্তি ও সন্তোষ—তাহার

মধ্যে ঐশ্বরিক ন্যায়ই বিরাজমান ; হৃদয়ের তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে, পাপের অপরিহার্য্য কঠোর শাস্তিই প্রকাশ পায়। আমাদের প্রতি মঙ্গলময় বিধাতার কত করুণা, কত স্নেহযত্ন তাহার পরিচয় আমরা প্রতিপদে প্রাপ্ত হইতেছি, প্রতি মুহূর্ত্তই তাহা অভিনব জ্বলন্ত বাক্যে ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার মঙ্গলভাব,—কি ক্ষুদ্র,কি বৃহৎ,—প্রকৃতির সকল ঘটনার মধ্যেই দেদীপ্যমান। ঐ সকল ঘটনা আমাদের নিকট অতিপরিচিত বলিয়াই আমরা ভুলিয়া যাই ; কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই উহা আমাদের বিস্ময়মিশ্র কৃতজ্ঞতার উদ্রেক করে, এবং জীবের প্রতি যাঁহার অসীম প্রেম সেই প্রেমময় পরম দেবের মহিমা ঘোষণা করে।

এইরূপে, আমরা যে তিন শ্রেণী নির্দ্ধারণ করিয়াছে, ঈশ্বর সেই তিনি শ্রেণীয় সৌন্দর্য্যের,—ভৌতিক, তাত্ত্বিক ও নৈতিক সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব।

আবার এই তিন শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীতেই সৌন্দর্য্যের যে দুই প্রকার রূপ বিদ্যমান—অর্থাৎ সুন্দর ও মহান্—তাহা তাঁহাতেই আসিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে। ঈশ্বরই পরম সুন্দর; কেননা, আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তিকে—জ্ঞান, কল্পনা ও হৃদয়কে তিনি ভিন্ন আর কে পরিতৃপ্ত করিতে পারে? তিনিই আমাদের জ্ঞানের উচ্চতম ধারণা—যাহার পর আর কিছুই অন্বেষণ করিবার নাই। তিনিই আমাদের কল্পনার আত্মহারা ধ্যান, তিনিই আমাদের হৃদয়ের পরম প্রেমাস্পদ। অতএব তিনিই পূর্ণরূপে সুন্দর। তিনি যেরূপ সুন্দর, সেইরূপ কি তিনি মহান্ও নহেন? স্বকায় অসীম মহিমার দ্বারা তিনি যেমন একাদকে আমাদের চিন্তার দিগন্তকে প্রসারিত করিতেছেন, তেমনি আবার তিনি তাঁহার অতলস্পর্শ মহিমার মধ্যে আমাদিগকে নিমজ্জিত করিতেছেন। তাঁহার করুণা-রশ্মি যেমন আমাদের হৃদয়-পদ্মকে প্রস্ফুটিত করে, তেমনি তাঁর কঠোর ন্যায় কি আমাদিগের মনে ভীতির সঞ্চার করে না? ঈশ্বরের স্বরূপে প্রসন্ন ও রুদ্রভাব উভয়ই বিদ্যমান। ঈশ্বর যেমন একদিকে মধুর, তেমনি আবার তিনি ভীষণ। একদিকে যেমন তিনি এই দৃশ্যমান সসীম জগতের জীবন, আলোক, গতি ও অক্ষয় শোভা, তেমনি আবার তিনি অনাদি, অদৃশ্য, অসীম অনন্ত, পরিপূর্ণ অদ্বৈত ও সত্তার সত্তা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ঈশ্বরের এই ভীষণ উপাধিগুলি যাহা পূর্ব্বোল্লিখিত উপাধিরই মত সুনিশ্চিত—উহা কি আমাদের কল্পনায় একপ্রকার বিষাদের ভাব উৎপাদন করে না—যাহা ভীষণ গম্ভীর দৃশ্য দর্শনে আমাদের মনে নিয়ত উত্তেজিত হইয়া থাকে? ঈশ্বর, আমাদের নিকট সুন্দর ও মহান্; এই দুই প্রকার সৌন্দর্য্য-রূপেরই তিনি আদর্শ ও উৎস ; কেন না, তিনি যেমন একদিকে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা, তেমনি আবার সকল প্রহেলিকার তিনিই সুস্পষ্ট সমস্যাবাক্য। আমরা সীমাবদ্ধ জীব,—আমরা অসীমকে যেমন বুঝিতে পারি না, তেমনি আবার অসীমকে ছাড়িয়াও কিছুরই সমীচীন ব্যাখ্যা করিতে পারি না। আমাদের যে সত্তা আছে, সেই সত্তার দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের সেই অসীম সত্তার কতকটা আভাস পাই; আমাদের মধ্যে যে অসত্তা বিদ্যমান, সেই অসত্তার দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের সত্তার মধ্যে বিলীন হই। এইরূপে, কোন কিছুর ব্যাখ্যা করিতে হইলেই নিয়ত তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে হয়; এবং তাঁহার অনন্ততার ভারে প্রপীড়িত হইয়া যখন অবার আপনার মধ্যে ফিরিয়া আসি,

তখন--যিনি আমাদিগকে উর্দ্ধে উত্তোলন করিতেছেন, যিনি আমাদিগকে অভিভূত করিতেছেন, সেই ঈশ্বরের প্রতি আমরা পর্য্যায়ক্রমে অথবা যুগপৎ, একটা অদম্য আকর্ষণের ভাব, বিস্ময়ের ভাব, দুরতিক্রম্য ভীতির ভাব অনুভব করি, যাহা একমাত্র তিনিই উৎপাদন করেন এবং যাহা তিনিই প্রশমিত করিতে পারেন ; কেন না একমাত্র তিনিই ভীষণ ও সুন্দরের সাম্যস্থল।

এইরূপে সেই পূর্ণ পুরুষ ঈশ্বরই,—পূর্ণ একত্ব ও অসীম বৈচিত্র্যের সমবায়; সুতরাং তিনিই সমস্ত সৌন্দর্য্যের চরম হেতু, চরম ভিত্তি, চরম আদর্শ। Diotime এই চিরন্তন সৌন্দর্য্যেরই একটু আভাস পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার "Le Banquet" নামক সন্দর্ভে সেক্রেটিসের নিকট সেই সৌন্দর্য্যের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"সেই অনাদি অনন্ত সৌন্দর্য্য, অজাত অবিনশ্বর সৌন্দর্য্য, যাহার ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই ; যাহার এক অংশ সুন্দর ও অপরাংশ কুৎসিৎ—এরূপ নহে ; শুধু অমুক সময়ে সুন্দর, অমুক স্থানে সুন্দর, অমুক সম্বন্ধে সুন্দর, এরূপও নহে ; যে সৌন্দর্য্যের কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ নাই,—মুখ নাই, হস্ত নাই, শারীরিক কিছুই নাই ; অথবা যাহা অমুক চিন্তাও নহে, অমুক বিশেষ বিজ্ঞানও নহে, আপনা হইতে ভিন্ন অন্য কোন সত্তার মধ্যেও যাহা অবস্থিতি করে না ; যাহা কোন জীব, কিংবা পৃথিবী, কিংবা আকাশ কিংবা অন্য কোন বস্তু নহে; যাহা সম্পূর্ণরূপে তাদাত্ম্যবিশিষ্ট, যাহা আত্মবিকারশূন্য, অন্য সকল সৌন্দর্য্য যাহার অংশ মাত্র ; যাহার জন্মনাই, মৃত্যু নাই, ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই, কোন পরিবর্ত্তন নাই।

এই পূর্ণ সৌন্দর্য্যে উপনীত হইতে হইলে, এই মর্ত্তলোকের সৌন্দর্য্য হইতে আরম্ভ করিতে হয় ; এবং সেই পরম সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, ক্রমাগত আরোহণ করিতে হয়, যাত্রাকালে সোপানের সমস্ত ধাপগুলা মাড়াইয়া যাইতে হয় ;—একটা সুন্দর দেহ হইতে, দুইটি সুন্দর দেহে, দুইটি সুন্দর দেহ হইতে, অন্য সমস্ত সুন্দর দেহে; সুন্দর দেহ হইতে, সুন্দর ভাবে; সুন্দর ভাব হইতে সুন্দর জ্ঞানে, এইরূপ জ্ঞান হইতে জ্ঞানান্তরে আসিয়া, পরে সেই পরম জ্ঞানে আমরা উপনীত হই,—যে জ্ঞানের বিষয়, সুন্দর-স্বরূপ স্বয়ং। এইরূপে অবশেষে আমরা সুন্দরকে স্বরূপতঃ জানিতে সমর্থ হই।"

"মাতিনের বিদেশী আরও এইরূপ বলিতে লাগিলেন ঃ—প্রিয় সখা সক্রেটিস, সেই অনাদি সৌন্দর্য্যের দর্শনেই জীবন সার্থক হয় ··· যে ব্যক্তি অবিমিশ্র সৌন্দর্য্যকে দেখিতে পাইয়াছে, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যকে, সরল সৌন্দর্য্যকে দেখিতে পাইয়াছে—যে সৌন্দর্য্য নর-মাংসে, নর-বর্ণে আচ্ছাদিত নহে, যাহা নশ্বর উপাদানে গঠিত নহে,—সেই অদ্বৈত সৌন্দর্য্যের, সেই ঐশ্বরিক সৌন্দর্য্যের যে সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়াছে, তাহার কি সৌভাগ্য !—সেই ধন্য ! সেই ধন্য !"

এপিক্‌টেটসের উপদেশ।

আত্মশক্তির জ্ঞান ও সাধনা।

১। যাহা তোমার সামর্থ্যের অতীত, এরূপ কাজে যদি প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমাকে নিশ্চয়ই লজ্জিত হইতে হইবে ; শুধু তাহা নহে, যে কাজ তোমা দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিত, তাহাও ফস্‌কাইয়া যাইবে।

২। একজন জিজ্ঞাসা করিল:—"আমি কোন্ কাজের উপযুক্ত তাহা আমি কি করিয়া জানিব?" এপিক্‌টেটস্ উত্তর করিলেন;—সিংহ যখন নিকটবর্ত্তী হয়, তখন বৃষ কি নিজের শক্তি বুঝে না, এবং সমস্ত গরুর পালকে রক্ষা করিবার জন্য সে কি একাকী অগ্রসর হয় না? অতএব যাহার শক্তি আছে, নিজ শক্তি সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানও আছে। যেমন বলবান্ বৃষ মুহূর্ত্তের মধ্যে তৈয়ারি হয় না, সেইরূপ কোন মনুষ্যপুঙ্গবের মহৎ চরিত্রও মুহূর্ত্তের মধ্যে গঠিত হয় না। শক্তি অর্জ্জনের জন্য কঠোর সাধনা চাই, এবং বিনা-সাধনায় লঘুচিত্তে কোন দুঃসাধ্য কার্য্যের দিকে ধাবমান হওয়া নিতান্ত অনধিকারচর্চ্চা বলিয়া জনিবে।

আর কত দিন?

১। কত দিনে তুমি উচ্চতর কাজ করিবার যোগ্যতা লাভ করিবে? বিবেক-বুদ্ধিকে কিছুতেই অতিক্রম করিবে না—এ শিক্ষা তোমার কবে হইবে? উপদেশ ত অনেক পাইয়াছ, কিন্তু সেই অনুসারে কি তুমি কাজ করিতেছ? তোমার চরিত্র সংশোধনের জন্য এখনও কোন্ গুরুর অপেক্ষায় আছ? তুমিত বালক নহ, তুমি এখন পূর্ণবয়স্ক মনুষ্য। নিজ চরিত্রশোধনে এখনও যদি অবহেলা কর, শিথিলযত্ন হও, ক্রমাগত প্রতিজ্ঞার পর প্রতিজ্ঞা করিতে থাক,—প্রতিদিনই যদি মনে কর, আজ না—কাল হইতে আমি কার্য্য আরম্ভ করিব, তাহা হইলে তুমি উন্নতির পথে একপদও অগ্রসর হইতে পারিবে না;—যাহারা জীবন্মৃত অবস্থায় আছে, সেই অপদার্থ হতভাগ্য ইতরলোক-দিগেরই মত তোমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

২। অতএব, পূর্ণবয়স্ক পুরুষের যাহা উপযুক্ত, উন্নতিশীল মনুষ্যের যাহা উপযুক্ত —সেইরূপ কাজে এখনি প্রবৃত্ত হও। যাহা কিছু উত্তম বলিয়া জানিবে, তাহাই যেন তোমার জীবনের বীজমন্ত্র হয়। বৃথা কাল হরণ করিবে না। শুভযোগ হারাইবে না। আমাদের এই জীবন মহারণ-ক্ষেত্র। এক দিনের যুদ্ধেই জয় কিংবা পরাজয় হইতে পারে।

৩। বিবেক ছাড়া আর কিছুরই প্রতি সক্রেটিসের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল না বলিয়াই তিনি এতটা মহত্ত্ব অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তুমি সক্রেটিস না হইতে পার, কিন্তু সক্রেটিসের মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা তোমার সাধ্যাতীত নহে।

স্মর্ত্তব্য কথা।

বিপদ আপদের জন্য এই কথাগুলি সর্ব্বদাই তোমার হাতের কাছে প্রস্তুত রাখিবে:—"হে ঈশ্বর, হে বিধাতা, যেথা-নেই তুমি আমাকে যাইতে বলিবে আমি যেন নির্ভয়ে সেইখানেই যাইতে পারি। কুমতির প্ররোচনায় যদি কখন আমার অনিচ্ছা জন্মে, তবু যেন তোমার আদেশ পালনে সমর্থ হই।" "সেই ব্যক্তিই আমাদের মধ্যে জ্ঞানী, সেই ব্যক্তিই দৈব-ব্যাপার সকল বুঝিতে সমর্থ, যে অক্ষুব্ধ-চিত্তে ও উদার-অন্তঃকরণে ভবিতব্যতার সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া লইয়াছে।" "দেবতাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন হউক। মৃত্যু আমার শরীরকেই ধ্বংস করিতে পারে, আমার আত্মার কোন হানি করিতে পারে না।"

আকবরের উদারতা।

মোগলসম্রাটরবি আকবর বিশাল ও উদার হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ জয় করিতে গিয়া তাঁহাকে বিবিধ জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সংঘর্ষে আসিতে হইয়াছিল। ফলতঃ যে সকল হিন্দু-রাজা ও রাজপুত-রাজন্যগণ তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্যের স্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন, হিন্দু হইলেও তাঁহাদের রাজভক্তি ও ঐকান্তিকতা সন্দর্শনে, আকবর স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। আকবর নিজে রাজপুত রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ঐ রাজপুত ললনার গর্ব্ভেই বাদসাহ জাহাঙ্গীরের জন্ম। ঐ পুত্রের পরিণয় ব্যাপারও রাজপুত-কন্যার সহিত ঘটিয়াছিল। উত্তরকালে ঐ হিন্দুরমণীর গর্ব্ভে সাজাহানের জন্ম হয়। এইরূপে হিন্দুভাব হিন্দুধর্ম্মের ভিতরে প্রবেশবাসনা আকবরের হৃদয়ে স্বতই জাগিয়া উঠিয়াছিল। সত্য কেবলমাত্র যে মুসলমানধর্ম্মের নিজ সম্পত্তি নহে, সকল ধর্ম্মের ভিতরে অল্লাধিক পরিমাণে উহা যে বিরাজমান, ক্রমে তিনি তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার হৃদয় এইরূপে যতই উদার হইতে উদারতর হইতে লাগিল, ততই তিনি ব্রাহ্মণ ও সুমানি পণ্ডিতগণের সহিত অসঙ্কোচে ধর্ম্মালাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে পুনর্জন্ম ও আত্মার অমরত্বে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিল। ভাগ্যক্রমে তিনি বিরাটহৃদয় ও আপনার সহিত তুল্য ভাবাপন্ন ফৈজি ও আবুলফজেল দুইভাইকে আপন সভার সদস্য পাইয়াছিলেন। আকবরের জীবনের সহিত ঐ দুইজনের ঘনিষ্ঠতম যোগ। ফৈজি ও আবুল ফজেল উভয়েই সুপণ্ডিত সেখ মোবারকের পুত্র। সেখ মোবারকের পিতৃপিতামহগণ আরবদেশীয় হইলেও তাঁহারা বহুপূর্ব্ব হইতে রাজপুতানার অন্তর্গত নাগর নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। যোগ্যপুত্রদ্বয় যোগ্যপিতার নিকট হইতে বাল্য হইতেই উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ফৈজি ১৫৪৭ খৃঃঅব্দে আগ্রার সান্নিধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়সে ফৈজি আকবর হইতে ৫ বৎসরের কনিষ্ঠ। ফৈজি সাহিত্যচর্চ্চায় ও চিকিৎসা ব্যবসায় দিনপাত করিতেন। কবি বলিয়া তাঁহার নাম ক্রমে বিখ্যাত হইয়া উঠিল। বিনামূল্যে দরিদ্ররোগীসকলকে চিকিৎসা করিয়া এবং দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তিনি আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। ফৈজি নিজে সিয়া, সুন্নিগণ তাঁহার বৈরী। আকবর চিতোর অবরোধ কালে সুখ্যাতি শুনিয়া ফৈজিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সুন্নিগণ ভাবিল এইবার ফৈজির আর নিস্তার নাই। তাহারা ফৈজিকে বন্দিভাবে আকবরের নিকট প্রেরণ করিল। কিন্তু বাদসাহ তাঁহার অশেষ-গুণ ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সদয়-ভাবে গ্রহণ করিলেন, এবং নিজপুত্রগণের উচ্চ শিক্ষা জন্য ফৈজিকে নিয়োগ করিলেন। সময়ে সময়ে বাদসাহের আদেশে ফৈজিকে দৌত্যকার্য্য করিতে হইত।

ফৈজি অবসর পাইয়া কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন। ৩৩ বৎসর বয়সে ফৈজি রাজকবিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। সাত বৎসর পরে ফৈজির মৃত্যু ঘটে। ফৈজির কবিতাসংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। তাঁহার নিজ পাঠাগারে সংগৃহীত হস্ত-লিখিত পুস্তক সংখ্যা প্রায় চারি সহস্র ছিল।

আইন-আকবরি রচয়িতা সেখ আবুল ফজেলের প্রতিষ্ঠা, তাঁহার ভ্রাতা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। আবুল ফজেলের জন্ম খৃঃ ১৫৫১ সালের ১৪ই জানুয়া-

রিতে ঘটে। আবুল ফজেল এমনই বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিলেন, যে পঞ্চদশ বৎসর বয়সেই তিনি বিবিধ শাস্ত্রে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং ২০ বৎসর বয়সে স্বাধীন ভাবে অধ্যাপনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। পিতা ও সহোদরের ন্যায় ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার উদারতা বাদশাহ আকবরকে বিমুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে আবুল ফজেল বাদসাহ সভায় আসিয়া প্রকাশ্য ভাবে যোগ দিলেন। আবুল ফজেলের বয়স ২৩ বৎসর, এই বয়সেই তিনি নিজভাষায় প্রকাশিত ও প্রচলিত যাবতীয় পুস্তক পড়িয়া শেষ করিয়াছিলেন। জ্ঞানপিপাসু আবুল ফজেল বলিতেন "আমার মনের শান্তি নাই; আমার প্রাণ মঙ্গোলিয়ার পণ্ডিত, লেবাননের সাধু, তিব্বতের লামা, পর্টুগালের পাদ্রী, পারস্যের ধর্ম্মযাজক, জেন্দাভেস্তার উন্নত উপাসকের সহিত আলাপ করিতে ব্যাকুল। নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতির গ্রন্থ পড়িয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া পড়িয়াছে।"

আবুল ফজেলের সহিত আকবরের প্রকৃত বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। আকবর কখন বা রণক্ষেত্রে কখন বা শীকারে কখন বা রাজ্য-শাসনে ব্যতিব্যস্ত; কিন্তু তাহাতে তত আনন্দ পাইতেন না, যত আনন্দ সমদর্শী আবুল ফজেলের সহিত ধর্ম্মান্ধ মৌলবীদিগের বিচার-শ্রবণে। এই যে ধর্ম্মালোচনা ইহা আকবরের জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাদসাহ হইয়া প্রথম ২০ বৎসর যুদ্ধ-বিগ্রহে তাঁহার কাটিয়া যায়। কিসে সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, কিসে বিভিন্ন জাতির অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারিবেন, তাহার উপায় উদ্ভাবনে আকবর এক্ষণে প্রয়াসী হইলেন। আকবর ঠিকই বুঝিয়াছিলেন, যে রাজ্যের স্থানে স্থানে সৈন্য রক্ষায় বিজিত দেশে কিছুতেই অক্ষয় শান্তি-প্রতিষ্ঠিত হয় না; কিন্তু শাসিত প্রজাগণের হৃদয়ের আশা, মনের ভাবগতি সম্যক উপলব্ধি করিয়া, যথাসম্ভব উহার তৃপ্তিদানকল্পে চেষ্টা না পাইলে, সে রাজ্যের কিছুতেই কল্যাণ নাই। বাদসাহ ঠিকই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যদি কোন সমধিক কবিতাপ্রিয় ভাব-প্রধান জাতি পৃথিবীতে থাকে, তবে তাহা হিন্দুজাতি; পূর্ব্বপিতৃ-পিতামহগণের সহিত অচ্ছেদ্য যোগ—প্রাচীন-গৌরব জাগাইয়া রাখিতে যদি কোন জাতি বিশেষ ভাবে সমুৎসুক, তবে তাহা হিন্দুজাতি। চারিশতবৎসরব্যাপী বিদেশীয় কর্ত্তৃক ভারতবিজয় কাহিনী আকবর সন্ধান লইয়াছিলেন। বিদেশীয়-শাসন কেন যে এতকাল ভারতে স্থায়ীত্ব লাভ করিতে পারে নাই, তাহার কারণও পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। আকবর দেখিলেন, বিজিতকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলে চলিবে না; বিজিতকে সম্মান করিতে হইবে, তাহাদের জাতি ধর্ম্মের ও প্রাচীনত্বের গৌরব রক্ষা করিতে হইবে, সকলকে এক ভাবে বাঁধিতে হইবে এবং ধর্ম্মে ও মতে উদারতা স্থাপন করিতে হইবে।

আবুলফজেলের সহিত আকবরের পরিচয় হইবার পুর্ব্বে বাদসাহ উপরুক্ত নিজ অভীষ্ট সম্পাদনে একপ্রকার হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ বিষয়ে নিরপেক্ষ উপদেশ দিবার তাঁহার কেহই ছিল না। মুসলমান সাঙ্গোপাঙ্গগণ বিজিতগণের উপর নির্য্যাতনের উপদেশ দিত। বাদসাহের উপর ধর্ম্মান্ধ মৌলবীগণের প্রভুত্ব নিতান্ত অল্প ছিল না। আবুলফজেলকে পাইয়া তিনি ঐ সকল ক্ষীণদর্শী মৌলবীর হিন্দু-বিদ্বেষ কলুষিত পরামর্শ ও যুক্তি পরিহার করিতে লাগিলেন। বিজিত হিন্দুগণকে দায়ীত্বপূর্ণ

রাজকার্য্যে নিয়োগের মূল্যবত্তা তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইল। ফতেপুর সিক্রির এবাদাৎখানা প্রাসাদে বসিয়া প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে বাদসাহ পণ্ডিত-মণ্ডলী লইয়া বিচার ও আলোচনা করিতে লাগিলেন। বাদসাহ দেখিলেন, মুসলমান ধর্ম্মের ভিতরেও নানা সম্প্রদায়, পরস্পরের মধ্যে কেবলই বিবাদ-বিসম্বাদ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে সকল উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্ম্মচারী রাজকার্য্যে নিযুক্ত, অবসর পাইলে তাহারা পরস্পরকে অপদস্থ করিতেও বিশেষ ব্যগ্র। আকবর আদেশ করিলেন, তোমাদের মধ্যে যদি কেহ ভবিষ্যতে এইরূপ অকারণ বিবাদে প্রবৃত্ত হও, তদ্দণ্ডেই রাজদরবার পরিত্যাগ করিতে হইবে।

এক বৃহস্পতিবার রজনী মুখে এবাদাৎখানায় সভা হইয়াছে। আবুল ফজেল প্রস্তাব তুলিলেন, যে বাদসাহ যে কেবল সাম্রাজ্যের রাজা তাহা নহে, প্রজাবর্গের ধর্ম্ম-বিষয়ে—আধ্যাত্মিক রাজ্যেও তাঁহাকে গুরু ও নেতা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বাদসাহ জানিতেন, কোরাণের এমন অনেক স্থান আছে, মৌলবীরা যাহার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন; এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা হজরত মহম্মদের নৈতিক জীবনে দোষারোপ করিতে অসঙ্কুচিত। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর এরূপ সাব্যস্ত হইল, বাদসাহ যে কেবল রাজ্যের ন্যায়বান রাজা তাহা নহে, কিন্তু তিনি "মুজতাহিদ" অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ে অভ্রান্ত। মোলবীগণ গত্যন্তর না দেখিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে আকবরের নির্দ্দেশানুবর্ত্তী হইতে স্বীকার পাইল এবং অঙ্গীকার-পত্রে কেহ বা ইচ্ছায় কেহ বা অনিচ্ছায় নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া দিল।

আবুল ফজেল বলেন যে এইরূপ পরিবর্ত্তনের ফল অতীব কল্যাণগর্ত্ত হইয়াছিল। এক উদারতার যুগ আবির্ভূত হইল। রাজদরবারে অবাধে বিভিন্ন ধর্ম্মালোচনা চলিতে লাগিল, বিভিন্ন ধর্ম্মের মনোজ্ঞ উপদেশাবলী অবাধে গ্রাহ্য হইতে লাগিল। মতের ঔদার্য্যের সঙ্গে বিভিন্ন জাতির ভিতরে মৈত্রী স্থাপিত হইতে চলিল, অনুদার ও ক্রূরভাবাপন্নগণ তদ্দৃষ্টে লজ্জায় অবনতমস্তক হইতে লাগিল। আবুল ফজেলের প্রাজ্ঞ বৃদ্ধপিতা পূর্ব্বোক্ত অঙ্গীকার-পত্রে নাম স্বাক্ষর করিবার সময় বলিয়া ছিলেন, হায়! যে উদার যুগের জন্য আমি সারা জীবন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, সেই শুভসময় আসিয়া উপস্থিত।

আকবর এক্ষণে সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীন। তিনি তাঁহার হৃদ্গত শুভ কামনা কার্য্যে পরিণত করিবার অবসর পাইয়াছেন। সর্ব্ববিষয়ে উদারতা তাঁহার রাজ্যের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু পার্শী খ্রীষ্টিয়ান তাঁহার রাজদরবারে যাতায়াত করিবার অধিকার পাইয়াছে। আকবর নিজ ঔদার্য্যে বীরহিন্দুরাজগণকে টানিয়া আনিয়া সাম্রাজ্যকে অচলপ্রতিষ্ঠ করিতেছেন।

বাদসাহের সহিত আবুলফজেলের মৈত্রী অক্ষুন্ন দেখিয়া ধর্ম্মান্ধ মুসলমানগ তাঁহার উপর খড়্গহস্ত। এই বিদ্বেষফলে আবুল ফজেলকে পরে প্রাণ হারাইতে হয়। আকবর তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথক্ কৃত করিলেন। তাঁহার প্রধান বিচারক সুন্নি ছিলেন, তিনি সিয়াগণকে নির্য্যাতন করিতেন বলিয়া বাদসাহ তাঁহাকে সসম্মানে বিদায় করিয়া দিলেন। আদেশ দিলেন হিন্দু মুসলমান যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হউক না কেন, রাজদ্বারে

সমান বিচার প্রাপ্ত হইবে। প্রভূত সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ ফৈজি ও আবুল ফজেল উভয়েই বাদসাহের আদেশে সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা বাদসাহের সঙ্গে বিভিন্ন দেশজয়ে গমন করিয়া অবসর মতে বাদসাহকে রাজস্ব বিভাগে এবং বিভিন্ন সংস্কার-কার্য্যে পরামর্শ দিতে লাগিলেন।

আকবর অতঃপর নিজ ধর্ম্মমত দেশ-কালের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে সচেষ্টিত। "দিন ই ইলাহি" বলিয়া উহা খ্যাত। বাদসাহ নিজে ধর্ম্মের রক্ষক, এবং ঈশ্বর এক, ইহা বিঘোষিত হইল। নেমাজের জন্য নূতন মন্ত্র রচিত হইল। কিছু কিছু ভাব হিন্দু ও পার্শী ধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইল। পার্শীদিগের শকাব্দা বাদসাহ দপ্তরখানায় প্রচলিত হইল। ভগবান দাস, মানসিং, টোডারমল, বীরবলের মত অসামান্য ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইল। আকবর ফৈজিকে দিয়া নূতন বাইবেল পারস্য ভাষায় অনুবাদ করাইলেন, এবং গোয়া হইতে পাদ্রী রোডোকো একোয়া ডিভাবেকে আগ্রায় আনাইলেন। ব্রাহ্মণ, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান, য়িহুদি ও পার্শী পণ্ডিত-মুখে ইবাদত-খানায় বাদসাহ বিভিন্ন ধর্ম্মমত শুনিতে লাগিলেন। সকলেই নিজ নিজ মত সমর্থন ও প্রতিপন্ন করিতে ব্যাকুল। কেহ বা রোষ ভরে অধীর; তাহা দেখিয়া বাদসাহ বলিলেন "অন্তরে বিশ্বাস সুদৃঢ় না হইলে বাহিরে ধর্ম্মের ভাণে কি হইবে। আমি অনেক ব্রাহ্মণকে ভয় প্রদর্শনে মুসলমান করিয়াছি; কিন্তু সত্যালোকে আমার অন্তর এক্ষণে আলোকিত। তোমরা নিজ নিজ মতের অভিমানে অন্ধ। কিন্তু প্রমাণ না পাইয়া একপদও অগ্রসর হওয়া যায় না। যে পথ যুক্তিবলে প্রতিপন্ন, তাহাই ঠিক। কেবল প্রার্থনা আবৃত্তি, ত্বকচ্ছেদ, ভূমিতে মস্তক অবনত করিলে কি হইবে। ঐকান্তিকতা অভ্যাস কর।" তিনি মুসলমানদিগের প্রতি কঠোর ছিলেন; তিনি জানিতেন, বিজেতা বলিয়া তাহারা হিন্দু-নির্য্যাতনে রত। ধন্য উদারতা! হায় সভ্যতাভিমানী আমাদের বর্ত্তমান বিজেতাগণ, আকবরের এই অতুল্য সমদৃষ্টি বিংশ শতাব্দীতেও প্রকৃষ্টরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলেন না।

আকবরকে অনেকে জোরোয়াষ্টার-ধর্ম্মী বলিত, কেন না তিনি সূর্য্যের ভিতরে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিতে ভাল বাসিতেন। বাদসাহ অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে সুন্দর সুন্দর অংশ নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিলেন। এক ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের বৈরী হইয়া, যাহাতে সে ধর্ম্মকে বিদ্রূপ করিতে না পারে, সেই দিকে আকবরের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। রাজ্যের ভিতরে আকবর ধর্ম্মমতের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যাহাতে ধর্ম্মের নামে নর-হত্যা না হয়, তাহার দিকে তাঁহার খর দৃষ্টি ছিল। যে হিন্দু ললনা মৃত-স্বামীর সহিত সহমরণে যাইতে অনিচ্ছুক, যাহাতে তাহার উপর বিন্দুমাত্র বলপ্রয়োগ না হয়, তদ্বিষয়ে আকবরের বিশেষ শাসন ছিল।

ক্রমশঃ।

নানা-কথা।

নবধর্ম্ম।—আমরা গত চৈত্রের পত্রিকায় রেভাঃ ক্যাম্বেলের প্রচারিত নবধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছি, এবং তাঁহার মতের কতক আভাসও দিয়াছি। তিনি বলেন "সাধারণ লোকের ধারণা এইরূপ, যে পরমেশ্বর জগতের কোন অতীত প্রদেশে স্থিতি করিয়া সেখান হইতে তাঁহার সৃষ্টি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এবং ক্ষণজীবী

মনুষ্যের কুকার্য্যে বিরক্ত হইয়া উহার প্রতিবিধান মানসে আপন পুত্র ঈশাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন, যে ঈশার কষ্ট-ভোগে ও ক্রুশে তাঁহার অকাল মৃত্যুতে তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। ঈশা যে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, ইহা নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা। বিশ্বাসে অনুরাগে ও সেবাতেই ঈশ্বরের সমীপস্থ হওয়া যায়। আমরা সকলেই যে ঈশা—তাঁহারই পুত্র, এই রূপেই তাহার পরিচয় প্রদান করিতে পারি। ঈশার হত্যাকারী সকলেই জঘন্য প্রকৃতির লোক ছিল। বিচার-দোষেই ঈশার ক্রুশদণ্ড ঘটে। ঐরূপ জঘন্য প্রকৃতির লোক সকল দেশে সকল সময়েই আছে। ঈশা যদি আপন পরিচয় না দিয়া আবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, ঐ রূপ নৃশংস-ভাবে তাঁহার মৃত্যু যে পুনরায় না ঘটিবে, তাহা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে। অনেকে বলেন, ঈশার মৃত্যুতেই আমাদের পরিত্রাণ সম্ভবপর হইয়াছে। পরিত্রাণ! এ কি কথা! ঈশ্বর কি আমাদের ঘোর শত্রু, যে তাঁহার নিকট হইতে পরিত্রাণ চাই। তিনি কি আমাদের পিতা, জীবনের উৎস, পরমধাম, একমাত্র গম্যস্থান নহেন। তাঁহার নিকট হইতে পরিত্রাণ কি? কেনই বা আমরা তাঁহার নিকট হইতে পরিত্রাণ চাহিব। খৃষ্টধর্ম্মের কথিত মুক্তি, বিচার দিন, মুক্তিদানে ঈশার ক্ষমতা ও অধিকার, এ সকলই অর্থহীন জল্পনা। কে উহা বিশ্বাস করিতে চায়। ঐ সমস্ত ভ্রান্ত-ধারণা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

জাপান-টাইম্‌স।—জাপান টাইম্‌স নামক সংবাদ পত্র বলেন যে "ব্রাহ্মসমাজের সভ্য-সংখ্যা সামান্য হইলেও আমেরিকার একেশ্বরবাদী এবং জাপানের নব-বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহার প্রভাব অত্যন্ত অধিক। শিক্ষা-বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য বর্ত্তমানে অনেকগুলি যুবা স্বদেশীয়-ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিদেশে গমন করিয়াছেন। এই জাপানেই তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় ৫০ জন। ধর্ম্মসংস্কার ও শিল্পের উন্নতি লইয়া লোকের মনে যে আগুন জ্বলিয়াছে, ক্রমে তাহা রাজনীতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। ভারতে বিভিন্ন জাতিবর্ণ থাকিলেও সকলে একতার জন্য বিশেষ লালায়িত। এক্ষণে ভারতের বিভিন্ন-প্রদেশে যাতায়াতের অনেক সুবিধা ঘটিয়াছে। লর্ডকর্জ্জনের প্রবর্ত্তিত শাসননীতির উপর ভারতবাসীর বিরাগ-ফলে সকল চেষ্টার মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের ছায়া পড়িয়াছে। শান্ত ভাবে আন্দোলন চলে, ইহাই প্রার্থনীয়।"

শিল্প-শিক্ষা।—বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষা সমিতির আনুকূল্যে এ বৎসর ৯৮ জন ছাত্র শিল্প শিক্ষার জন্য বিদেশে গমন করিয়াছে। এই সভা চতুর্থ বর্ষে প্রবেশ করিল। প্রথম বর্ষে এই সভা হইতে ১৬টি ছাত্র বিদেশে প্রেরিত হয়, দ্বিতীয় বর্ষে ৪০টি ছাত্র প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ কয়েকটি ছাত্রকে উৎসাহ দিবার জন্য যে সান্ধ্য-সমিতি টাউনহলে বসিয়াছিল, তাহাতে বঙ্গের ছোট-লাট উপস্থিত ছিলেন। এ সভা হইতে বাস্তবিকই যে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। শিল্প-শিক্ষা ও উহার বিকাশ ভিন্ন আমাদের দৈন্য কিছুতেই ঘুচিবে না। উক্ত সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ আগামী মার্চ্চ মাসে ৯১টি যুবাকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মনি, আমেরিকা ও জাপানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। উক্ত সভার সঙ্কল্প যাহাতে সুসিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে সকলেরই মনোযোগী হওয়া উচিত। সর্ব্বসাধারণের আনুকূল্য ও অর্থ-সাহায্য ভিন্ন ঈদৃশ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার কার্য্যে পরিণত হওয়া বড় কঠিন। জাহাজওয়ালা আপকার কোম্পানি ও বি আই এস এন কোম্পানি ঈদৃশ পাঠার্থী যুবকগণের জন্য ভাড়াও কম করিয়া দিয়া সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন।

বিলাত-যাত্রা।—বরোদার গাইকবাড়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আলোয়ারের মহারাজা বিলাতযাত্রার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বরোদাপতি বিদেশ ভ্রমণে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, অথচ জাতীয়-ভাব পরিহার করেন নাই, ইহাই আমাদের বিশেষ আনন্দের।

প্রাচীন-কীর্ত্তি-রক্ষা।—লর্ড কর্জ্জনের অন্যান্য ত্রুটি থাকিলেও এদেশের প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। লর্ড কর্জ্জনের ঐ ভাব ক্রমে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আফগানস্থান এক সময়ে ভারতের অন্তর্ভূত এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু সকলেরই লীলাভূমি ছিল। এখনও তথায় বৌদ্ধ ও হিন্দু সময়ের নিদর্শন ও শিব-মন্দির বিদ্যমান। অমৃত-সরের প্রধান খাল্‌সা দেওয়ান, প্রাচীন শিখ-মন্দির অনুসন্ধান করিবার জন্য, ভাই করম সিংকে আফগানস্থানে পাঠাইতেছেন।

দেশের শ্রীবৃদ্ধি।—সংবাদপত্রে প্রকাশ যে মাঞ্চেষ্টার হইতে বিলাতী বস্ত্রের আমদানি হ্রাস হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বিগত বৎসরেরই ভিতরে দেশীয় মূলধনে ১৫টি ব্যাঙ্ক, ৫টি নৌ (navigation) কোম্পানি, ৪০টি স্বদেশী দ্রব্য ভাণ্ডার, ১টি দেশলাইএর কল, ২টি

কাচের কল, ২২টি সুতার কল, ২টি পাটের গাঁইট-বাঁধা কল, তৈল ও চিনির অনেকগুলি কারখানা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাদের মোট মূলধন-পরিমাণ ছয় ক্রোরের অধিক হইবে। এ সকলই ভারতের প্রকৃত সৌভাগ্য সূচনা করে।

মৎস্য-তত্ত্ব-শিক্ষা।—মৎস্য-তত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্য সার ফ্রেডারিক নিকলসনের(Sir Frederick Nicholson K. C. I. E.) প্রস্তাবে মাদ্রাজ হইতে দুই জন ভারতবাসীকে জাপানে পাঠাইবার হইতেছে এবং সমুদ্রকূলে (Fishery Station) মৎস্য ধরিবার আড্ডা স্থাপনের কথা চলিতেছে।

মৃত্যু-সংখ্যা।—ভারতের স্বাস্থ্য-বিভাগের (Sanitary Commissioner, India) প্রধান কর্ম্মচারীর বিবরণীতে প্রকাশ যে ভারতবর্ষে মৃত্যুসংখ্যা প্রতি বৎসর বাড়িতেছে। প্রতি সহস্রে ১৯০১ সালে ২৯ জন, ১৯০২ সালে ৩১ জন, ১৯০৩ সালে ৩৫ জন, ১৯০৪ সালে ৩৩ জন এবং ১৯০৫ সালে ৩৬ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ১৯০৫ সালে গোরাসৈন্যের ভিতরে রোগে প্রতি সহস্রে ১০ জন ও দেশীয় সৈন্য ৮ জন মারা গিয়াছে। আতঙ্কের কথা বলিতে হইবে।

নিরামিষ-ভোজন।—জুনাগাড়ের লাভশঙ্কর লক্ষ্মীদাস (Anglo-Indian temperance Association, London) লণ্ডনের এংগ্লোইণ্ডিয়ান্ টেম্পারেন্স সভাকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন, যে বিলাতে মদ্যের ব্যবহার প্রতি বর্ষে কমিতে থাকিলেও ভারতে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এদেশে খৃষ্টিয়ানগণের ভিতরেও মদ্যের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বোম্বাই-মিউনিসিপালিটির বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ,যে বান্দোরা সরকারি হত্যাশালায় ১৮৯৫ সালে গোহত্যার পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার, ৯৬ সালে প্রায় ৩২ হাজার, ৯৮ সালে প্রায় ৩৫ হাজার, ৯৯ সালে প্রায় ৩৬ হাজার এবং ১৯০০ প্রায় ৩৭ হাজার হয়। ইহাতেই প্রতীয়মান, যে শুদ্ধ মদ্য নহে, মাংসেরও প্রচলন দিন দিন বৃদ্ধির দিকে। বিলাতের (Smithfield Market) স্মিথফিল্ড্ বাজারের ১৯০২ সালের প্রকাশিত বিবরণীতে দেখা যায়, যে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও, বিক্রীত মাংসের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। অর্থাৎ ১৯০১ সাল অপেক্ষা ১৯০২ সালের নিহত-জীব-সংখ্যা ৩০ হাজার কম। যাহারা নিরামিষ-ভোজী, মদ্যের প্রচলন তাহাদের মধ্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডাক্তার Haig হেগ তাঁহার (Uric Acid) ইউরিক-এসিড নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, যে নিরামিষ-ভোজনে মদ্যের স্পৃহা চলিয়া যায়। ১৯০৫ সালের "Vegitarian" নিরামিষভোজী নামক পত্রিকায় প্রকাশ যে নিরামিষ-ভোজন-ব্যবস্থায়(Salvation Army) মুক্তি ফৌজের একটি আশ্রমে অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। অর্থাৎ কেবলমাত্র নিরামিষ-ভোজন-ফলে অনেকগুলি স্ত্রীলোক বহুবর্ষের অভ্যস্ত অপরিমিত মদ্য-সেবন পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহারা পূর্ব্বে এতই অসংযমী ছিল, যে অন্য কোন আশ্রমে তাহারা স্থান পায় নাই। লাভশঙ্কর ঐ সকল যুক্তি দেখাইয়া যাহাতে অপরিমিত মদ্য-সেবন সম্বন্ধে নিরামিষ ভোজনের উপকারিতা প্রচারিত হয়, তাহার কল্পে temperance টেম্পারেন্স সভাকে তৎপোষক পুস্তকাদি প্রচার ও বিতরণ জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা লাভশঙ্করের আবেদনের যুক্তির দিকে জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৭, মাঘ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪৩৯॥ ৩
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৩৯৫॥৶৬
সমষ্টি	...	২৮৩৫ ৶৯
ব্যয়	...	৩২৬॥৵০
স্থিত	...	২৫০৮॥৴৯

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত

আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন

পাঁচকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৩০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

২০৮॥৴৯

২৫০৮॥৴৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ২৯৯ ৶৯

মাসিক দান।

৺ মহর্ষিদেবের এষ্টেটের একজীকিউটার মহাশয়গণ

২০০৲

মাঘোৎসবের দান।

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী

২৲

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বসু

২৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু ঋতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৲

কোম্পানীর কাগজের সুদ

৮৫৶৯

২৯৯৶৯

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ১২।৵০

পুস্তকালয় ... ১৫।৵৬

যন্ত্রালয় ... ১০২॥৵০

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন ৬ ৵০

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন ... ৩৸০

সমষ্টি ... ৪৩৯॥ ৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ১৬৮৸৶০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৩৭ ⁄৬

পুস্তকালয় ... ৸⁄৬

যন্ত্রালয় ... ১০১৸ ৩

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন ... ১৭৸৶৯

সমষ্টি ... ৩২৬॥৵০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৭, ফাল্গুন মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয় ... ৪০৫॥৶০

পূর্ব্বকার স্থিত ... ২৫০৮॥⁄৯

সমষ্টি ... ২৯১৪। ৯

ব্যয় ... ৩৩০।৵০

স্থিত ... ২৫৮৩৸৵৯

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত

আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ

পাঁচকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৩০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

২৮৩৸৵৯

২৫৮৩৸৵৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ২১১৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষিদেবের এষ্টেটের একজিকিউটার মহাশয়গণ

২০০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন রায়

১০৲

এককালীন।

শ্রীযুক্ত বাবু সুকুমার মিত্র

১৲

২১১৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫৲
পুস্তকালয়	...	১।/০
যন্ত্রালয়	...	১৬১।৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	২৭৲
সমষ্টি	...	৪০৫॥৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৮৩। ৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩২ ৵৩
পুস্তকালয়	...	॥৵৯
যন্ত্রালয়	...	৯৭ ৶৩
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	১৭ /০
সমষ্টি	...	৩৩০।৵০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
শ্রীসত্য প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

আয় ব্যয়

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৭, চৈত্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩২৪॥/০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৫৮৩৸৵৯
সমষ্টি	...	২৯০৮।৶৯
ব্যয়	...	২৮৬।০
স্থিত	...	২৬২২ ৶৯

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
পাঁচকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৩০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত
৩২২ ৶৯

২৬২২ ৶৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২০০৲

মাসিক দান।
স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের এষ্টেটের একজীকিউটার মহাশয়গণ
২০০৲

২০০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১০৲
পুস্তকালয়	...	১৭৸৶০
যন্ত্রালয়	...	৯০।৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৬।০
সমষ্টি	...	৩২৪॥/০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৬৭। ৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৮৸৶০
পুস্তকালয়	...	১॥৵০
যন্ত্রালয়	...	৮৮।৵৯
সমষ্টি	...	২৮৬।০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদিব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

শাস্ত্রালোচনা।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র কি তাহা আমার গতবারের বক্তৃতার বিষয় ছিল। অদ্য সেই বিষয়ে আরো কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। আমাদের মধ্যে যাঁহারা কৃতবিদ্য, যাঁহারা শাস্ত্রের গণ্ডীর ভিতরে রহিয়াছেন, শাস্ত্রকেই যাঁহারা আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের দেখা উচিত ঐ গণ্ডীর স্বরূপ কি। তাহাতে যাহা আছে সকলই কি সত্য, সকলই কি গ্রাহ্য, না শাস্ত্রের ভিতর হইতে কতক ছাড়িবার, কতক বাছিয়া লইবার সামগ্রী আছে? আমরা মুখে বলি, বেদই সকল শাস্ত্রের মূল। কিন্তু বেদে বায়ু বরুণের স্তবস্তুতি, বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ড, বেদের নিয়োগপ্রথা আজকালকার পক্ষে কতদূর উপযোগী। আর এক কথা। বেদই যদি সকলের মূল হইল তাহা হইলে দেখা উচিত আমাদের আধুনিক আচার-পদ্ধতি কতদূর বেদ-সম্মত। আমাদের মধ্যে যে পৌত্তলিক উপাসনা, যে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত বেদ হইতে তাহার কতদূর সায় মিলে। যাঁহারা দেশাচারকে ধর্ম্ম বলিয়া মানেন, শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহাদের ভ্রম সংশোধনের উপায়। অনেকস্থলে শাস্ত্র দেশাচারের বিরোধী, সমাজসংস্কারের পোষক। আমাদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার আদর নাই কিন্তু দেখুন শাস্ত্রে তাহার কিরূপ পোষকতা করে। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" ইহাই শাস্ত্রের বাণী। বালবিধবার বিবাহের আবশ্যকতা যদিও মনে বুঝিতে পারি, কিন্তু দেশাচার উহার বিরোধী। বিদ্যাসাগর শাস্ত্র হইতে পোষক বচন বাহির করিয়া দেখাইলেন

> "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ,
> পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে"।

কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, দেশাচারই আমাদের শাস্ত্র।

শাস্ত্রানুশীলন একালে অপেক্ষাকৃত সহজ। পূর্ব্বে যত বাধা যত কাঠিন্য ছিল, এক্ষণে তাহা চলিয়া গিয়াছে। অনুবাদের সাহায্যে, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের

গবেষণার ফলে, শাস্ত্র-অধ্যয়নের পথ অনেকটা সুগম হইয়া পড়িয়াছে। বেদ উপনিষদ, দর্শন শাস্ত্র, রামায়ণ মহাভারত যাহা আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অনুবাদে সহজে তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারা যায়। "প্রাচ্য ধর্ম্মশাস্ত্র-সংগ্রহ" বলিয়া পণ্ডিত মোক্ষমুলার যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বহুমূল্য রত্নখণি। উহাতে বৈদিক সূক্ত, উপনিষদ, বৌদ্ধ গ্রন্থাবলির ইংরাজি অনুবাদ দেখিবেন। বেদান্ত-দর্শন শঙ্কর ও রামানুজের টীকা অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে; এবং ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করা আমাদের পক্ষে অনেক সহজ হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে বেদ বেদান্ত অভ্যাস করিতে হইলে সমস্ত জীবন চলিয়া যাইত, এক্ষণে আর তাহা আবশ্যক হয় না।

আমাদের শাস্ত্রাধ্যয়নের সময় এক কথা মনে রাখিতে হইবে যে শাস্ত্রের কালনির্ণয় সম্বন্ধে আমাদের ঐতিহাসিক তত্ত্ব সকলই অন্ধকার। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে কোন্ কোন্ শাস্ত্র কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বৌদ্ধধর্ম্মের পরবর্ত্তীকালে ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে কতক পরিমাণে আলোক পড়িয়াছে। সেকন্দর সম্রাটের ভারত আক্রমণ সময়ে গ্রীষীয়-ঐতিহাসিকদের বর্ণনায়, চীন পরিব্রাজকদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্তে, অশোকের অনুশাসনে, তাম্রলিপি আবিষ্কারে, কালনির্ণয়ের কতক সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু এদেশে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বের আভ্যন্তরিক অবস্থা নির্ণয় করা সামান্য কঠিন ব্যাপার নহে।

সামান্যতঃ বলা যাইতে পারে, শ্রুতি প্রাচীন, স্মৃতি তাহার পরবর্ত্তী। পুরাণ উহাদেরও পরবর্ত্তী এবং তন্ত্র আধুনিক সময়ের। অতিপ্রাচীন ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ সত্যকে শ্রুতি বলা যায়। উপনিষদ শ্রুতির অন্তর্গত। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যে প্রাচীন ও আধুনিক শাস্ত্র অনুমান করিয়া লইবার প্রতীতিজনক দিগ্‌দর্শনের অভাব এখনও রহিয়াছে। ঐ সকল শাস্ত্র মন্থন করিয়া সহজে যে সত্যসংগ্রহ করা যাইতে পার, তাহাও নহে। কতপ্রকার ভাব, কতপ্রকার মত উহার অন্তর্গত। ধর্ম্মবিষয়ে প্রধান মতভেদ দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদের গুরু শঙ্করাচার্য্য। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদী। মূলে সেই একই বেদান্তদর্শন, অথচ দ্বৈত অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত ভাবে [illegible] তাহার ত্রিবিধ টীকা ও ভাষ্য। এই মতভেদের কারণ কি? এই সকল আচার্য্যেরা জ্ঞাতব্য প্রপঞ্চবিষয়ে এক একটা সিদ্ধান্তে পূর্ব্বেই উপনীত হইয়াছিলেন, প্রকৃত তথ্য বলিয়া যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই স্বাধীন চিন্তার ফল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া প্রচার করিলেন; শ্রুতিকে নিজ নিজ মতানুসারে ব্যাখ্যাত করিলেন। শঙ্করের সময় শৈব বৈষ্ণব, কাপালিক নানা মতের প্রাদুর্ভাব। শঙ্কর নূতন শাস্ত্র ছাড়িয়া পুরাতন শাস্ত্রের আশ্রয় লইলেন। বেদ উপনিষদ, গীতাকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি দেখাইলেন শাস্ত্রকে যেমন ইচ্ছা, তেমন করিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। অগ্রে স্বাধীন চিন্তা দ্বারা একটি দর্শন গড়িয়া লও, পরে তদনুসারে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইল। "শাস্ত্র মৃত। শাস্ত্র কথা কহে না। তুমি যেমন ভাবে শাস্ত্রকে বলাইবে, শাস্ত্রও ঠিক তেমনি বলিবে। শাস্ত্র তোমার প্রতিভার অধীন।" এইরূপে শঙ্করাচার্য্য উপনিষদ্ গীতা প্রভৃতি

শাস্ত্র নিজের অদ্বৈত মতে গড়িয়া লই-লেন। তৎপরে অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্য উদিত হইয়া স্ব স্ব মত প্রচার করিলেন। এইরূপে দ্বৈত অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি নানা প্রকার বেদান্ত ব্যাখ্যার সৃষ্টি হইল। স্বাধীন চিন্তা কিয়দংশে রক্ষিত হইল সত্য বটে কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। লোক-সংগ্রহের জন্য অন্ততঃ মুখে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইল।

আর্য্য-সমাজের প্রণালীও ঐরূপ। তাঁহারা বেদের প্রামাণ্য ঘোষণা করেন, কিন্তু বেদের নূতন ব্যাখ্যা দিয়া—আপনার মনের মত গড়িয়া তুলিয়া সেই বেদকে ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি করিতে সচেষ্ট। সে চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে বলিতে পারি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে লোক-ভুলানো কৌশলের উপর ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা কখনই ফল-দায়ী হইতে পারে না। বালীর বাঁধের উপর গৃহপ্রতিষ্ঠার ন্যায় তাহা ক্ষণভঙ্গুর। ধর্ম্মের ভিত্তি সত্য, অন্ধ বিশ্বাস নহে। সত্য যে দিকে লইয়া যাইবে সেই দিকেই যাই-বার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ের জন্য শাস্ত্রানুশীলনের আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া শাস্ত্র একমাত্র প্রামাণ্য নহে। নানা প্রমাণের মধ্যে উহা অন্যতম। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে যাহা বেদে আছে তাহাই ধর্ম্ম। কিন্তু আমরা ফলে দেখিতে পাই, শ্রুতিস্মৃতি ছাড়িয়া আমরা দেশাচারকেই সর্ব্বোচ্চ আসনে স্থাপন করিয়াছি। দশবিধ সংস্কার, সন্ধ্যা, আহ্নিক, বারমাসের তের পার্ব্বণ, এইরূপ সংখ্যাতীত ক্রিয়াকলাপ পঞ্জিকাদৃষ্টে সম্পন্ন করিয়া মনে করি ইহাই ধর্ম্মের সর্ব্বস্ব। অনেক সময়ে যাহা ধর্ম্মের খোসা তাহাই সার বলিয়া মানি; যাহা ছায়া তাহাকেই সত্য জ্ঞান করি।

তবে ধর্ম্ম কি? শাস্ত্র বলিতেছেন—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণং।

শাস্ত্র, দেশাচার, আত্মতুষ্টি ধর্ম্মের এই ত্রিবিধ লক্ষণ। শাস্ত্র ছাড়িয়া দিলে দাঁড়ায় এই যে আত্মতুষ্টি এবং অহিংসা বা লোকহিত এই দুই ধর্ম্মের প্রমাণ। প্রথম, যাহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ হয় তাহাই অনুষ্ঠান করি-বেক। "মনঃ পূতং সমাচরেৎ"

"যৎকর্ম্মকুর্ব্বতোস্যসাৎ পরিতোষো হন্তরাত্মনঃ,
তৎপ্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতন্তু বর্জ্জয়েৎ"।

যে কর্ম্ম করিলে আত্মপ্রসাদ লাভ হয় তা-হাই যত্নপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবেক, তদ্বিপ-রীত যাহা কিছু তাহা পরিত্যাগ করিবেক।

দ্বিতীয়, লোকহিত। যাহাতে জন-সাধারণের কল্যান হয় তাহাই আচরণীয়। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলমন্ত্র অহিংসা বা লোকহিত। শাস্ত্রে ভূরি ভূরি এইরূপ বচন আছে যে দয়াতেই ধর্ম্ম, "নচ ধর্ম্মো দয়া-পরঃ"

নোপকারাৎ পরং পুণ্যং নাপকারাদঘং পরম্
ন ভূতানামহিংসায়াঃ জ্যায়ান্ ধর্ম্মোস্তি কশ্চন",
"অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ"
"যদানকুরুতে পাপং সর্ব্বভূতেষু কর্হিচিৎ
কর্ম্মণামনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা,"
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ"।

দয়াধর্ম্মের গৌরব সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ অনেকানেক প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আমি বলি অন্তরাত্মার পরিতোষই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। সে দিন ভবানীপুরে নফরচন্দ্র কুণ্ডু নর্দ্দামার গর্ত্তে নিপতিত দুইজন কুলির প্রাণরক্ষার জন্য অকা-তরে আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। এইরূপ নিঃস্বার্থ পরোপকারের ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রচ্ছন্ন থাকে না। কিন্তু তাহা কে নির্ণয় করে? শাস্ত্র নহে—শাস্ত্রে বলে হীনবর্ণের লোককে স্পর্শ করাও দোষাবহ; নর্দ্দমার

কর্দ্দমে দেহকে কলুষিত করাতে দোষ। তবে কি স্বজনরক্ষা বা লোকপ্রশংসা তাঁহার ঐ কার্য্যের নিয়ামক ছিল? তাহাও নহে। কেবল ধর্ম্মের আদেশে, অন্তরাত্মার প্ররোচনায় তিনি ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এবং ইংরাজ বাঙ্গালী সকলে মিলিয়া ঐ মহাত্মার স্তুতিবাদ করিতেছে।

ধর্ম্ম কি তাহা জানা সহজ, তাহার অনুষ্ঠানই কঠিন। অন্তরাত্মা হইতে প্রতিনিয়ত ধর্ম্মের আদেশ—কর্ত্তব্যের আদেশ আসিতেছে। মন্বাদি ঋষিরা যে ঐশ্বরিক আদেশ পাইয়াছিলেন, এখনও প্রতি সাধু-হৃদয়ে সে আদেশ-বাণী আসিতেছে। হৃদয়-ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলেই আমরা তাহা শ্রবণ করিতে পারি। নানা কারণে আমরা ঈশ্বরের সহিত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া, তাঁহার সেই গম্ভীর আদেশ-বাণী শুনিতে পাই না। তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, আপনাকে প্রস্তুত কর, হৃদয়কে পবিত্র কর, ব্যাকুল অন্তরে তাঁহার নিকট অগ্রসর হও, অবশ্যই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, তাঁহার বাণী শুনিতে পাইবে এবং তাঁহার প্রেরিত সত্যালোকে আপনার গন্তব্য ধর্ম্মপথ পরিস্ফুট হইবে।

জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং
পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।

অদৃশ্যমগ্রাহ্যং।

ঈশ্বর আমাদের নিকট "অদৃশ্যমগ্রাহ্যং"। তিনি চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হন না, হস্ত দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না। গীতায় ভগবান বলিতেছেন:—

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকোমামজমব্যয়ং।"
গীতা।

আমি যোগমায়ায় সমাবৃত থাকিয়া লোকের নিকট অপ্রকাশিত থাকি এই হেতু অজর অমর যে আমি আমাকে মূঢ় ব্যক্তি দেখিতে পায় না। ঈশ্বরকে কেন আমরা দেখিতে পাই না। আমরা সংসারের ক্ষুদ্র বিষয়ে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি, স্বার্থ সাধনে—আপনার মান, আপনার যশ খ্যাতি-প্রতিপত্তির পশ্চাতে ধাবিত হইতেছি, তাই আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। আমরা বিভ্রান্ত হইয়া মনে করি তিনি দূরে। গীতায় যেরূপ আসুরিক লোকের চিত্র অঙ্কিত আছে, আমাদের অনেকের অবস্থা সেইরূপ। তত্ত্বজ্ঞানহারা হইয়া আমরা মনে করি, ধর্ম্ম নাই, ঈশ্বর নাই, পরকাল নাই। বিষয়-লালসা ধনমদ আত্মাভিমান হৃদয়ে পোষণ করিয়া, আমরা আপনাকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত মনে করিয়া গর্ব্বিত ভাবে সঞ্চরণ করিতেছি এবং নিজ নিজ হৃদয়পুত্তলীর সেবাতে অহরহ নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি; তাই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর আমাদের অন্তরে অপ্রকশিত রহিয়াছেন। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আমরা তাঁহার স্থানে উপদেবতা প্রতিষ্ঠা করিতেছি, ইহা হইতেই আমাদের এই দুর্গতি। ফরাসিস্ বিপ্লব সময়ে মনুষ্যের প্রজ্ঞা (reason) ঈশ্বরের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল; এদেশে বৌদ্ধগণ ঈশ্বরকে ছাড়িয়া, ধর্ম্মকে নীতির উপরে প্রতিষ্ঠা করিয়া নির্ব্বাণ চাহিল। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া অন্য দেবতার সেবা হইতেই আমাদের দুর্গতি। ভারতবর্ষ সত্য সত্যই যে এইরূপ অধোগতি প্রাপ্ত হইবে, তাহা মনে হয় না। আমরা ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। আমাদের আদর্শ উচ্চতর। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র ও ঋষিবাক্য ভগবদ্ভক্তির মার্গ অনাদিকাল হইতে প্রদর্শন করিতেছেন। ঐ পথ অনুসরণ কর। প্রাচীন ঋষিরা জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে

ব্রহ্মকে আত্মস্থ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকেচ" ঈশ্বর দূর হইতে সুদূরে, আবার তিনি আমাদিগের এত নিকটে, যে হৃদয়ের মধ্যে বিরাজমান। তাঁহারা উপদেশ দিতেছেন, "তমাত্মস্থং যেনু-পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী।" যাঁহারা তাঁহাকে অন্তরের অন্তর করিয়া দেখেন, অপার তাঁহাদের শান্তি। ঈশ্বর স্বর্গে বা বৈকুণ্ঠে কেবলমাত্র বিরাজিত নহেন। সমস্ত বিশ্বে সকল কালে তাঁহার সমান আবির্ভাব। তিনি কোন এক স্থলে স্থায়ী হইয়া এই বিশ্বচরাচর শাসন করিতেছেন তাহা নহে। কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন, এবং চিরকালই থাকিবেন।

আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না বলিয়া কি কহিবে তিনি নাই? এই ক্ষণস্থায়ী ক্ষণ-ভঙ্গুর সংসার সত্য, আর যিনি সর্ব্বমূলাধার, তিনি কি নাই? আমরা নিজে অন্ধ, তাই বলিয়া কি সেই জ্যোতিস্বরূপ নাই? যিনি আশ্রয়রূপে থাকাতেই এই জগৎ সংসার বি-ধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে তিনি নাই? যাহা ছায়া, তাহাই কি সত্য? আর যিনি সত্য তিনিই কি ছায়া হইলেন? তিনি কি আমাদের সঙ্গের সঙ্গী নহেন? তিনি কি আমাদের হৃদয়ে সৎপ্রবৃত্তি প্রেরণ করিতেছেন না? পুণ্যপথ প্রদর্শন করিতেছেন না? অভয়-মুর্ত্তি দেখাইয়া আমাদের পাপ-তাপ নির্ব্বাণ করিতেছেন না? আমরা অন্ধ বলিয়া কি তাঁহার জ্যোতি অপ্রকাশিত থাকিবে? না, তাহা নহে। তিনি আমাদের জীবনে মৃত্যুতে সম্পদে বিপদে কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্ব-ত্রই রহিয়াছেন। যেখানে ন্যায় যেখানে সত্য, সেখানে তিনি; যেখানে সাধুতা, যেখানে মঙ্গল সেখানে তিনি। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে লোকে যেখানে সচেষ্ট, সেখানে তিনি; যেখানে নিঃস্বার্থতা—পরের জন্য আত্মত্যাগ, সেখানে তিনি; যেখানে শান্তি, সেখানে তিনি বিরাজমান।

কে বলে তাঁহাকে দেখা যায় না? হৃদয়-ক্ষেত্র প্রস্তুত কর, এখনই তাঁহার দর্শন পাইবে। তাঁহাকে দেখিতে অভ্যাস কর, বুঝিবে তিনি দূরে নহেন। গৃহ-কর্ত্তার ন্যায় তিনি ক্ষণেকের জন্য গৃহ ছাড়িয়া অদৃশ্যে রহিয়াছেন, ভৃত্যদিগের উপরে সমস্ত নির্ভর স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন এবং পরীক্ষা করিবার জন্য অন্তরাল হইতে দেখিতেছেন, যে তাহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেছে কি না। পিতার ন্যায় পুত্রকে আত্মরক্ষণের ভার দিয়া তিনি আপনি নিভৃতে স্থিতি করিতেছেন। তিনি চান, আমরা ধর্ম্মপথে থাকিয়া শিক্ষিত ও বলিষ্ঠ হই, আত্ম নির্ভর শিক্ষা করি। কিন্তু তা বলিয়া আমারদিগকে দূরে ফেলিয়া রাখেন নাই। তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়া-ছেন, দিব্যজ্ঞানে তাঁহাকে দর্শন করিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত থাক।

সেই ব্রহ্মই আমাদের লক্ষ্য। সকলে ব্রহ্মের অনুরূপ হইতে সচেষ্ট হও, তাঁহার সাদৃশ্য ধারণ কর, স্বার্থ বিসর্জ্জন কর, উন্নত আশা হৃদয়ে পোষণ কর, কর্ত্তব্যের আদেশে হীনতা পরিহার কর, প্রবৃত্তি সকলকে ধর্ম্মের অনুগত কর। এই সকল উপায়ে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হইবে, ধর্ম্মভাব বিকশিত হইবে। যে পরিমাণে আধ্যাত্মিক উন্নতি, সেই পরি-মাণে তাঁহাকে আত্মাতে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে। ভ্রাতৃগণ! সাবধান যেন তোমাদের অন্তরের দীপ কোন কালে নির্ব্বাণ হইয়া না যায়। সে আলোক যে আত্মাতে প্রজ্ব-লিত, সেখানেই তাঁহার প্রকাশ। অন্তঃকরণ যাঁহার পরিশুদ্ধ, ব্রহ্মদর্শন তাঁহার পক্ষে সুগম। তিনি দেখিতে পান

"স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স সপশ্চাৎ সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ"

তিনি উপরে তিনি নীচে তিনি সম্মুখে তিনি পশ্চাতে তিনি চারিদিকে। সকল দিক উজ্জ্বল করিয়া তিনি দীপ্তি পাইতেছেন। তাঁহাকে স্তব কর, জ্ঞান প্রসাদে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব হইয়া তাঁহার ধ্যানে মগ্ন হও, যাহাতে সেই নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্ম-দর্শনে চিরতৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে এবং মনুষ্য জন্মের চির-সার্থকতা সম্পাদন করিয়া কৃতার্থ হইবে।

সত্য; সুন্দর, মঙ্গল।

সুন্দর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিল্পকলা।

প্রাকৃতিক পদার্থের মধ্যে সুন্দরকে শুধু জানা ও ভালবাসাই মানুষের একমাত্র কাজ নহে; মানুষ উহাকে পুনরুৎপাদন করিতেও পারে। ভৌতিক কিংবা নৈতিক যে প্রকারেরই হউক না কেন, কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিবা মাত্র মানুষ তাহা অনুভব করে, তাহাতে মুগ্ধ হয়, সৌন্দর্য্যরসে আপ্লুত ও অভিভূত হইয়া পড়ে। এই সৌন্দর্য্যের অনুভূতি প্রবল হইলে, উহা বেশীক্ষণ নিষ্ফল থাকে না। যাহা হইতে আমরা একটা তীব্রতর সুখ অনুভব করি তাহাকে পুনর্ব্বার দেখিতে আমাদের ইচ্ছা হয়, পুনর্ব্বার অনুভব করিতে ইচ্ছা হয়; যে সৌন্দর্য্যে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে আমাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়; সে যেমনটি ঠিক্ তাহাই নহে, পরন্তু আমাদের কল্পনা তাহাকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছে সেইভাবেই তাহাকে আমরা পুনর্জ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করি। তাহা হইতেই মানুষের নিজস্ব মৌলিক রচনার উৎপত্তি—শিল্পকলার উৎপত্তি। সৌন্দর্য্যকে স্বাধীনভাবে পুনরুৎপাদন করাই শিল্পকলা এবং এই পুনরুৎপাদনের শক্তিকেই প্রতিভা বলে।

সৌন্দর্য্যের এই পুনরুৎপাদনের জন্য কোন্ কোন্ মনোবৃত্তির প্রয়োজন? সৌন্দর্য্যকে চিনিবার জন্য, অনুভব করিবার জন্য যে যে মনোবৃত্তির প্রয়োজন ইহাতেও সেই সব মনোবৃত্তির প্রয়োজন। কলারুচি চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইলেই প্রতিভা হইয়া দাঁড়ায়,—যদি তাহাতে আর একটি উপাদান সংযোজিত হয়। সে উপাদানটি কি?

মনের সেই মিশ্র বৃত্তি যাহাকে রুচি বলে; তাহাতে তিনটি মনোবৃত্তির সমাবেশ আছেঃ—কল্পনা, রসবোধ, বুদ্ধি-বিবেচনা।

প্রতিভার স্ফূর্ত্তির পক্ষে এই তিনটি মনোবৃত্তি নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নহে। প্রতিভা, সৃজনী-শক্তিরই উপাধি; উহাই প্রতিভার বিশেষ লক্ষণ। কলা-রুচি অনুভব করে, বিচার করে, তর্ক বিতর্ক করে, বিশ্লেষণ করে, কিন্তু উদ্ভাবন করে না। প্রতিভা উদ্ভাবক, ও স্রষ্টা। প্রতিভাবান পুরুষের মধ্যে যে শক্তি অবস্থিত, প্রতিভাবান পুরুষ সেই শক্তির প্রভু নহেন। তিনি যাহা অন্তরে অনুভব করেন, তাহা বাহিরে প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার যে দুর্দ্দমনীয় জ্বলন্ত আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয় তাহাই তাঁহাকে প্রতিভাবান করিয়া তোলে। যে সকল ভাব, যে সকল কল্পনা, যে সকল চিন্তা তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করে তাহার দরুন তিনি কষ্ট অনুভব করেন। লোকে বলে, গুণীলোক মাত্রেরই একটু ছিট্ আছে। কিন্তু এ 'ছিট্' জ্ঞানেরই একটি দিব্য অংশ। সক্রেটিস, এই রহস্যময়ী

শক্তিকেই, তাঁহার "দানব" (দানা Demon) বলিতেন। ভল্‌টেয়ার ইহার নাম দিয়াছিলেন,—মূর্ত্তিমান সয়তান: প্রতিভাবান নাটককার হইতে হইলে, মন্ত্রের দ্বারা এই সয়তানকে আহ্বান করিতে হয়। নাম যাহাই দেও না কেন, একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে—জানিনা সে জিনিসটা কি—যাহা প্রতিভাকে জাগাইয়া তোলে। এবং প্রতিভাবান পুরুষ যতক্ষণ অন্তরের ভাব বাহিরে ব্যক্ত করিতে না পারেন, স্বকীয় সুখ দুঃখ, স্বকীয় মনোভাব, স্বকীয় কল্পনাকে মূর্ত্তিমান করিয়া প্রকাশ করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাহার মনে সান্ত্বনা নাই—আরাম নাই। অতএব প্রতিভাতে দুইটি জিনিস্ বিশেষ রূপে থাকা চাই। প্রথমত উৎপাদন করিবার জন্য একটা জ্বলন্ত আগ্রহ; দ্বিতীয়ত উৎপাদন করিবার শক্তি। কেননা, শক্তি বিনা শুধু আগ্রহ—সে একটা ব্যাধি বিশেষ।

কার্য্য সম্পাদনী শক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি, সৃজনী শক্তি—মুখ্যরূপে ইহাই প্রতিভা। সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই কলারুচি সন্তুষ্ট। মিথ্যা প্রতিভা, জ্বলন্ত অথচ অকর্ম্মণ্য কল্পনা, নিষ্ফল স্বপ্নেই আপনাকে নিঃশেষিত করে,—সে এমন কিছুই উৎপাদন করে না যাহা বৃহৎ কিংবা মহৎ। কল্পনাকে সৃষ্টিতে পরিণত করাই প্রতিভার ধর্ম্ম।

প্রতিভা সৃষ্টি করে—নকল করে না। কেহ কেহ বলেন, প্রতিভা প্রকৃতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; কেন না, প্রতিভা প্রকৃতিকে নকল করে না। প্রকৃতি ঈশ্বরের রচনা; অতএব মানুষ ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

ইহার উত্তর খুব সোজা। না, প্রতিভাবান পুরুষ ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। তিনি ঐশী রচনার শুধু ব্যাখ্যাকর্ত্তা। প্রকৃতি তাঁহার নিজের ধরণে ব্যাখ্যা করেন, মানব প্রতিভাও তাহার নিজের ধরণে ব্যাখ্যা করে।

শিল্পকলা প্রকৃতির অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে—এই কথা লইয়া পূর্ব্বে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এই কথাটি আমরাও একটু বিচার করিয়া দেখিব। অবশ্য একভাবে দেখিতে গেলে, শিল্পকলা অনুকরণই বটে; কেন না, নিরবলম্ব নিরাধার সৃষ্টি একমাত্র ঈশ্বরেতেই সম্ভবে। যাহা প্রকৃতিরই অংশ সেই সব মূল-উপাদান ভিন্ন প্রতিভা আর কি লইয়া কাজ করিবে? কিন্তু প্রকৃতির অনুকরণ ভিন্ন তাহার কি আর কোন কাজ নাই?—ঐ গণ্ডির মধ্যেই কি সে বদ্ধ? প্রতিভা কি বাস্তবের শুধু নকল-নবীশ? অবিকল নকল করাতেই কি তাহার একমাত্র গুণপনা? যে জীবসৃষ্টি আসলে অননুকরণীয় তাহার অবিকল নকল করা অপেক্ষা নিষ্ফল উদ্যম আর কি হইতে পারে? যদি শিল্পকলা প্রকৃতির দাসবৎ শিষ্য হয়, তাহা হইলে সে শিষ্য নিতান্তই অক্ষম বলিতে হইবে।

যে প্রকৃত কলাগুণী সে প্রকৃতিকে মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করে, সে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়। কিন্তু প্রকৃতির সকল পদার্থই সমান চিত্ত-বিমোহন নহে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রকৃতিতে এমন একটা জিনিস আছে, যাহাতে করিয়া প্রকৃতি শিল্প কলাকে অনন্তগুণে অতিক্রম করে—সে জিনিসটা কি?—না জীবন। এই জীবনকে ছাড়িয়া দিলে, শিল্পকলা প্রকৃতিকেও অতিক্রম করে—কেবল যদি সে অবিকল অনুকরণের প্রয়াসী না হয়। যতই সুন্দর হউক না কেন, কোনও প্রাকৃতিক পদার্থই সর্ব্বাংশে নিখুঁৎ নহে। যাহা কিছু বাস্তব তাহাই অপূর্ণ। কোন কোন স্থলে দেখা যায়

লালিত্য ও শোভনতা,—মহান ভাব হইতে, শক্তির ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন। সৌন্দর্য্যের অবয়বগুলি বিক্ষিপ্তভাবে, বিভক্তভাবে সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। যদৃচ্ছাক্রমে তাহাদিগকে একত্র মিলিত করিলে,—কোন একটা নিয়মের অধীন না হইয়া, এ-মুখ হইতে একটা ঠোঁট, ও-মুখ হইতে একটা চোখ্ বাছিয়া লইলে—একটা অস্বাভাবিক কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি গড়িয়া তোলা হয় মাত্র। এই নির্ব্বাচনে যদি কোন একটা নিয়ম অনুসরণ করা হয় তাহা হইলেই একটা আদর্শ স্বীকার করা হইল—যাহা ব্যক্তিবিশেষ হইতে ভিন্ন। যে ব্যক্তি প্রকৃত কলাগুণী সে প্রকৃতির অনুশীলন করিয়া এইরূপ একটা আদর্শ খাড়া করিয়া তোলে। অবশ্য প্রকৃতিকে ছাড়িয়া এরূপ আদর্শ সে কখন কল্পনা করিতেও পারিত না; কিন্তু এই আদর্শটি পাইয়াই সে তাহার দ্বারা স্বয়ং প্রকৃতিকেও বিচার করে—সংশোধন করে; এমন কি প্রকৃতির সমকক্ষ হইতেও স্পর্দ্ধা করে।

কল্পনার আদর্শই গুণীজনের জ্বলন্ত অনুরাগ ও ধ্যানের বিষয়। চিন্তার দ্বারা বিশোধিত, ভাব-রসের দ্বারা সঞ্জীবিত যে আদর্শ সেই আদর্শটিকে নীরবে ও একান্তমনে ধ্যান করিতে করিতে গুণীজনের প্রতিভা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। কিরূপে সেই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করা যায়—জীবন্ত করিয়া তোলা যায়, তৎপ্রতি গুণীজনের একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্খা জন্মে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ যাহা কিছু তাঁহার কাজে লাগিতে পারে সেই সমস্ত উপাদান তিনি প্রকৃতি হইতে সংগ্রহ করেন এবং মাইকেল অ্যাঙ্গেলো যেরূপ মৃন্ময় মার্ব্বলের উপর তাঁহার খনিত্রের ছাপ দিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি স্বকীয় হস্তের প্রবল শক্তি প্রয়োগ করিয়া, সেই উপাদান হইতে এরূপ রচনা বাহির করেন যাহার অনুরূপ আদর্শ প্রকৃতির মধ্যে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি তাঁহার সেই মানস-আদর্শেরই অনুকরণ করেন যাহা একপ্রকার দ্বিতীয় সৃষ্টি বলিলেও হয়। ব্যক্তিত্ব ও জীবনের হিসাবে উহা প্রাকৃতিক সৃষ্টি অপেক্ষা নিকৃষ্ট; কিন্তু এ কথা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যায় যে, তাত্ত্বিক ও নৈতিক সৌন্দর্য্যের হিসাবে উহা প্রাকৃতিক সৃষ্টি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। তাঁহার সেই রচনার উপর তাত্ত্বিক ও নৈতিক সৌন্দর্য্য মুদ্রিত থাকে।

নৈতিক সৌন্দর্য্যই সমস্ত প্রকৃত সৌন্দর্য্যের মূল। প্রকৃতি-রাজ্যে এই মূলটি একটু আচ্ছন্ন একটু প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ঐ আবরণ হইতে শিল্পকলাই উহাকে বিনির্ম্মুক্ত করে এবং উহাকে স্বচ্ছ করিয়া তোলে। শিল্পকলা, নিজের শক্তি সম্বল যদি ঠিক বুঝে, তাহা হইলে ঐ দিক্ হইতেই প্রকৃতির সঙ্গে সে টক্কর দিতে পারে এবং তাহাতে কতকটা সফল হইতেও পারে।

শিল্পকলার চরম উদ্দেশ্য কি প্রথমে তাহাই নির্দ্ধারণ করা যাক্। শিল্পকলার নিজস্ব শক্তি যেখানে, উহার চরম উদ্দেশ্যও সেইখানে। ভৌতিক সৌন্দর্য্যের সাহায্যে কিরূপে নৈতিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা যায় ইহাই শিল্পকলার চরম উদ্দেশ্য। ভৌতিক সৌন্দর্য্য নৈতিক সৌন্দর্য্যেরই সাঙ্কেতিক রূপ। অনেক সময়ে এই সাঙ্কেতিক রূপটি প্রকৃতির মধ্যে তমসাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। শিল্পকলা উহাকে আলোকে আনিয়া উহার উপর এরূপ প্রভাব প্রকটিত করে যাহা প্রকৃতিও সব সময়ে সেরূপ করিয়া উঠিতে পারে না। প্রকৃতি

চিত্তরঞ্জনে অধিকতর সমর্থ; কেন না প্রকৃতির রচনায় জীবন আছে—জীবন থাকায় কল্পনা ও নেত্র উভয়ই মুগ্ধ হয়। পক্ষান্তরে শিল্পকলা মর্ম্মস্পর্শ করে, কেন না উহা প্রধানতঃ নৈতিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া, মনের গভীর আবেগ সমূহের যে সূত্রস্থান একেবারে সেইখানে গিয়া আঘাত করে। এবং এই মর্ম্মস্পর্শিতাই উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যের নিদর্শন ও প্রমাণ। দুই প্রান্তই সমান বিপদজনক; এক, মৃত মানস-আদর্শ, আর এক মানস-আদর্শের অভাব। বাস্তব-আদর্শের (model) যতই কেন নকল কর না হয়ত সেই রচনায় প্রকৃত সৌন্দর্য্যের অভাব হইবে; আবার নিছক্ স্বকপোলকল্পিত কোন রচনা করিলেও হয়ত এমন একটা অনির্দ্দেশ্য কাল্পনিকতা আসিয়া পড়িবে যাহাতে কোন একটা বিশেষত্ব নাই।

কি পরিমাণে মানসের সহিত বাস্তবের—রূপের সহিত ভাবের মিলন হওয়া উচিত, প্রতিভা তাহা চট্ করিয়া ধরিতে পারে—ঠিক্ ধরিতে পারে। এই সম্মিলনই শিল্পকলার চরম উৎকর্ষ। এবং ইহাই উৎকৃষ্ট রচনা সমূহের প্রকৃত মূল্য।

আমার মতে, শিল্পশিক্ষাতেও এই নিয়মের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। লোকে জিজ্ঞাসা করে, ছাত্রেরা মানস-আদর্শের অনুশীলনের দ্বারা, না বাস্তবের অনুকরণের দ্বারা শিক্ষা আরম্ভ করিবে? আমি কোন দ্বিধা না করিয়া এইরূপ উত্তর করি:—শিক্ষার আরম্ভে উভয়েরই অনুশীলন আবশ্যক। স্বয়ং প্রকৃতিদেবী, বিশেষকে ছাড়িয়া সামান্যকে, কিংবা সামান্যকে ছাড়িয়া বিশেষকে আমাদের সম্মুখে কখনই অর্পণ করেন না। প্রত্যেক মূর্ত্তিতেই কতকগুলি ব্যক্তিগত বিশেষ লক্ষণ আছে—যাহা অন্য সমস্ত হইতে ভিন্ন; এবং তাছাড়া সাধারণ লক্ষণও আছে যাহাতে করিয়া উহা মানবমূর্ত্তি বলিয়া চেনা যায়। যাহারা চিত্রবিদ্যা শিখিতে প্রথম আরম্ভ করে, তাহাদিগের পক্ষে কোন মূর্ত্তির বিশেষ লক্ষণ ও আদর্শ লক্ষণ উভয়ই অনুশীলন করা আবশ্যক। আমার বোধ হয়, শুষ্ক ও সূক্ষ্ম নির্বিশেষতা হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য, প্রথম হইতেই কোন স্বাভাবিক পদার্থের—বিশেষতঃ কোন জীবন্ত মূর্ত্তির নকল করা ভাল। এইরূপ করিলে, ছাত্রেরা প্রকৃতির বিদ্যালয়েই শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। তাহা হইলে, সৌন্দর্য্যের যে দুইটি প্রধান উপাদান, শিল্পকলার যে দুইটি অপরিহার্য্য নিয়ম তাহা কখনই তাহারা বিসর্জ্জন করিবে না; উহাতে তাহারা গোড়া হইতেই অভ্যস্ত হইবে।

কিন্তু এই দুইটি উপাদান সম্মিলিত করিবার সময় উহাদের প্রত্যেককে ঠিক্ চেনা আবশ্যক এবং কোন স্থানে কিরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে তাহাও বুঝা আবশ্যক।

এমন কোন মানস-মূর্ত্তি কল্পিত হইতে হইতে পারে না যাহার একটা নির্দ্দিষ্ট আকার নাই; এমন কোন একতা হইতে পারে না, যাহাতে বিচিত্রতা নাই; এমন কোন জাতি থাকিতে পারে না, যাহাতে ব্যক্তি নাই; কিন্তু যাই হোক্, মানস-আদর্শই সুন্দরের ভিতরকার জিনিস; এই মানস-আদর্শকে বাস্তবতায় পরিণত করাই প্রকৃত শিল্পকলা,—অমুক অমুক বিশেষ আকারের অনুকরণে প্রকৃত শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যায় না।

(ক্রমশঃ)

আকবরের উদারতা।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

ধর্ম্মের ভাণ ও অহঙ্কার আকবরের ভাল লাগিত না। বাদসাহ বাদুনি নামক জনৈক বিদ্বান মুসলমানের সাহায্যে রামায়ণ ও মহাভারতের কতকাংশ এবং ফৈজিকে দিয়া নলদময়ন্তী পারস্য ভাষায় অনুবাদ করান। বাদসাহ বিবিধ পুস্তক দেশ বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ঐ সকল গ্রন্থ অপরের নিকট শ্রবণ করিতেন। অবসরমত যতটুকু পাঠ হইতে পারে, সাঙ্গ হইলে বাদসাহ নিজ হস্তে পুস্তক-পৃষ্ঠায় দাগ দিয়া রাখিতেন। যে কয়েকখানি পত্র পাঠ হইল, তদনুসারে পুস্তক-পাঠককে পুরস্কার দান করিতেন। তদানীন্তন কালে প্রকাশিত ইতিহাস দর্শন ও বিজ্ঞানের সমস্ত তথ্য বাদসাহ নিজে বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। যাহাতে তাঁহার সৈন্যগণ বিজিত দেশের জনগণের স্ত্রী-পুত্রের উপর নির্য্যাতন বা তাহাদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিতে না পারে, তৎসম্বন্ধে তিনি তাঁহার রাজত্বের সপ্তম বৎসরে সুস্পষ্ট আদেশ প্রচার করেন। হিন্দু-তীর্থযাত্রীর নিকট শুল্ক আদায়ের যে নিয়ম ছিল, রাজস্ব-বিভাগের ক্ষতি হইলেও আকবর তাহা একেবারেই উঠাইয়া দেন। হিন্দু-ভাবে যাহারা ঈশ্বরকে ভজিতে চায়, বাদসাহ বলিতেন, আমি কেন তাহাদের অন্তরায় হইব, কেনই বা তাহাদের নিকট অযথা-রূপে কর গ্রহণ করিব। বিধর্ম্মী অর্থাৎ হিন্দুদিগের উপরে জিজিয়া বলিয়া যে কর আদায় হইত,আকবর তাহা উঠাইয়া দিলেন। বিধর্ম্মী বলিয়া তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতে জানিতেন না। আকবর বিধবা বিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। আকবর হিন্দুগণের অল্পবয়স্কা কন্যা-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। বাদসাহ ধর্ম্মের নামে পশুহত্যা নিষেধ করেন। প্রার্থনার নিতান্ত আতিশয্য, উপবাস দান তীর্থযাত্রার আধিক্য, তাঁহার দৃষ্টিতে ভাল লাগিত না। তিনি বলিতেন, নিরবচ্ছিন্ন উহাতে ডুবিয়া থাকিলে চলিবে না, কর্ত্তব্যবহুল জীবনে কার্য্য করিবার অনেক আছে; সন্ন্যাসী সাজিয়া বেড়াইলে কি হইবে। বাদসাহ এককালে ত্বকচ্ছেদ উঠাইবার চেষ্টা না পাইয়া দ্বাদশ-বৎসর উহার প্রশস্তকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি গোহত্যার পক্ষপাতী ছিলেন না। এমন কি শূকর মাংসও যে অঘৃণ্য নহে, তাহাও তিনি বলিয়া যান। কুকুর মুসলমানগণের চক্ষে অপবিত্র বলিয়া নিন্দিত হইলেও আকবর তাহাকে অপবিত্র বলিতেন না। মদিরা মুসলমানের অস্পৃশ্য হইলেও বিহিত পরিমাণে মদ্যপানের তিনি বিরোধী ছিলেন না। আকবর শেষ বয়সে শ্মশ্রুমুণ্ডনেরও পক্ষপাতী হয়েন। তিনি বলিতেন ভারতের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কেশ মুণ্ডনের বিরোধী হইলে চলিবে না। ধাত্রীমাতার সন্তান আজিজ নানারূপ অনিষ্ট করিলেও আকবর তাহার উপর কঠোর শাস্তি প্রদান না করিয়া বলিতেন আজিজের উপর আমি কঠোর হইতে পারি না; আজিজ ও আমার মধ্যে দুগ্ধের বন্ধন রহিয়াছে; আমি কিছুতেই তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে পারি না। বাদসাহ একাধারে সুপুত্র, অনুরক্ত স্বামী, স্নেহশীল পিতা ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লোক-চরিত্র নির্ণয়ে বাদসাহের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। মুসলমানেরা বলিত বাদসাহ হিন্দু-যোগীর সহিত মিলিয়া তাহাদের নিকট হইতে অপরের অন্তরের ভাব বুঝিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। মৃগয়া ও সঙ্গীতে আকবরের বিশেষ অনুরাগ ছিল।

আহার-সামগ্রীতে আকবর বিলাসী ছিলেন না। মাংস পছন্দ করিতেন না। কোন কোন মাসে মাংস একেবারেই ছাড়িয়া দিতেন। তিনি ফল ভাল বাসিতেন। ফতে-পুরসিক্রীতে নানাবিষয়িণী কথাবার্ত্তায় সময়ে সময়ে বাদসাহের প্রায়ই শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত কাটিয়া যাইত। তাহার পরে সঙ্গীত আলাপে নিশাবসান হইত। প্রত্যূষে বাদসাহ অন্দরে প্রবেশ করিয়া স্নানান্তে রাজবেশে বাহির হইতেন। রাজ-কার্য্যে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইত। তাহার পর আহারান্তে বৈকালে নিদ্রা যাইতেন। কোন দিন প্রাতে চৌগান বা পোলো খেলা খেলিতেন। আধুনিক এই polo পোলো খেলা এই ভারত হইতেই ইংলণ্ডে নীত হইয়াছে।

আকবরের অনেকগুলি মহিষী ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে ৮ জন প্রধানা। এই ৮ জনের ভিতরে রাজা ভগবানদাসের ভগিনী অন্যতমা; আর একজন যোধপুর রাজ-কন্যা, তাঁহারই গর্ভে জাহাঙ্গীরের জন্ম। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি জাহাঙ্গীরের যে স্ত্রী সাজাহানের মাতা, তিনি যোধপুররাজ উদয়সিংহের কন্যা।

রাজস্ব-সম্বন্ধে আকবরের নীতি বিশেষ বিজ্ঞাবত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি সাম্রাজ্যের ভিতরে সমস্ত জমি মাপ করাইয়াছিলেন। আনুমানিক উৎপন্ন প্রতি বিঘা স্থির করিয়া উহার ভিতর হইতে রাজার প্রাপ্য অংশ নির্দ্দিষ্ট ও উহার মূল্য ধার্য্য করিয়া দিয়াছিলেন। বাদসাহ স্থানে স্থানে গোশালা ও ভাবী দুর্ভিক্ষ হইতে প্রজা-রক্ষা জন্য শস্য-গোলা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কৃষিকার্য্যে উৎসাহ দিয়া কৃষকের দারিদ্র নিবারণে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এমন কি আবশ্যক হইলে প্রজাগণকে বীজধান্য সরকার হইতে দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ভূমিকে ৫টি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দিয়া গতপূর্ব্ব ১৯ বৎসরের শস্যের মূল্যের হার ধরিয়া প্রজার দেয় খাজনার পরিমাণ ধার্য্য করিয়া দিয়াছিলেন এবং বর্ষে বর্ষে খাজনা বন্দোবস্ত না করিয়া প্রতি দশ বৎসরের জন্য সরাসরি মতে প্রজাদিগের সহিত বন্দোবস্তের প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বিচারের জন্য কাজি ও তাহাদের উপরে সদর উপাধিধারী বিচারক নিয়োগ করিয়া দেন। যখনই রাজকর্ম্মচারীকর্ত্তৃক উৎকোচ গ্রহণের বা অত্যাচারের সংবাদ পাইতেন, তখনই তাহাকে কঠোরশাস্তির সহিত বিদায় করিয়া দিতেন। ইহাতে রাজস্ব আদায়কারী কর্ম্মচারী সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত, প্রজাগণও অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইত। জমি মাপিবার জন্য বাদসাহ নবনব উৎকৃষ্ট যন্ত্রের সাহায্য লইতেন। কথিত আছে বাদসাহ প্রতি বিঘায় দশ সের পরিমাণ কর (royalty) গ্রহণ করিতেন। পরে ঐ শস্যাংশের পরিবর্ত্তে মূল্যগ্রহণের প্রথা প্রচলিত হয়। যাহারা অর্থহীন অথচ সাহিত্যানুরাগী, যাহারা সংযমী ও আত্মত্যাগী, যাহারা দরিদ্র ও দুর্ব্বল, যাহারা বিদ্যাহীন অথচ উচ্চ বংশজাত, তাহাদের উপর বাদসাহের বিশেষ সহানুভূতি ও কৃপা ছিল। বাদসাহ অনুগত ও উপযুক্ত অনুচরগণকে জায়গীর দিতেন; যাহারা পূর্ব্ব রাজত্ব আমলে বিনা কারণে ও সামান্য উপলক্ষে জায়গীর পাইয়াছিলেন, বা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরেও জায়গীর ভোগ করিতেছিলেন, তাহাদের জায়গীর বাজেআপ্ত করিয়াছিলেন। রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ে রাজা টোডার মাল বাদসাহের পরামর্শদাতা ছিলেন।

হিন্দু হইলেও টোডারমালের বিশেষ অনুরক্তি আকবরের উপর ছিল। অপরাধ বিশেষে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা থাকিলেও শাসনকর্ত্তাগণ যাহাতে এই দণ্ড সম্বন্ধে কৃপণতা প্রকাশ করেন, বাদসাহের এইরূপ আদেশ ছিল, এবং ঐ দণ্ড পরিচালন সম্বন্ধে সময়ে সময়ে বাদসাহের অনুমতি লইতে হইত। বাদসাহ নিজে জাঁকজমক-প্রিয় না হইলেও বর্ত্তমান ইংরাজ-শাসন-কর্ত্তাদিগের ন্যায় বুঝিয়াছিলেন, যে আড়ম্বর ভারত-শাসনের একটি প্রধান অঙ্গ। এজন্য সময়ে সময়ে তাঁহার আড়ম্বরপ্রিয় হইতে হইত। মধ্যে মধ্যে সুবর্ণ-রৌপ্য-হীরা জহরত লইয়া তুলাদণ্ডে আপনাকে ওজন করাইতেন এবং ঐসমস্ত মণিমাণিক্য দীনদরিদ্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন। কখন বা ছাগ মেষ পক্ষী বিতরণ করিতেন, এবং নিজ হস্তে রাজসভার অমাত্যগণকে সুমিষ্ট ফলাদি উপহার দিতেন। সময়ে সময়ে হীরাজহরতশোভিত বাদসাহ সুবর্ণ সিংহাসনে বসিতেন; মূল্যবান পরিচ্ছদে অমাত্যগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত; সম্মুখ দিয়া হীরকাস্তরণ-ভূষিত হস্তী অশ্ব চলিয়া যাইত; শৃঙ্খল-বদ্ধ গণ্ডার সিংহ ব্যাঘ্র কুক্কুর শিকারী শ্যেন পক্ষী সম্মুখে নীত হইত।

আকবরের শাসন গুণে হিন্দু উৎপীড়ন চলিয়া গিয়াছিল। সমগ্র ভারতবর্ষকে এক রাজছত্রের অধীনে আনিয়া বাদসাহ অপার তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। এক ধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতরে সমগ্র ভারতবর্ষকে আনয়ন করা যে বড় সুকঠিন, তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি সকলকে এক স্বার্থের রজ্জুতে বাঁধিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি জ্ঞান ও ধর্ম্মের বিদ্বেষী ছিলেন না। সকল প্রকার পূজা পদ্ধতির উপর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। ঈশ্বর এক এবং মহম্মদ তাঁহার (prophet) প্রবক্তা একথা কোরাণের সময় হইতে চলিয়া আসিলেও আকবর ঘোষণা করিলেন যে ঈশ্বর এক এবং তিনি নিজে তাঁহার (Vice-regent) আজ্ঞাপালক। বাদসাহ মুসলমানদিগের পর্ব্বাদির অল্পমাত্রই মানিয়া চলিতেন। তিনি বলিলেন, হজরত মহম্মদ পৌত্তলিকগণের নিকট ঈশ্বরের একত্ব ঘোষণা করিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সুসংবাদ ঘোষণা করিবার জন্যই তাঁহার জন্ম। কিন্তু কোরাণের ব্যাখ্যাদোষে—তলবারের সাহায্যে উহার ঘোষণা চলিয়া আসিয়াছে। ইহারই জন্য এত বিবাদ। আকবর বলিতেন, যে এ ধর্ম্মকে আমি তরবারের ধর্ম্ম হইতে দিব না। ধর্ম্ম-বিষয়ে আমি সকলকে স্বাধীনতা দিব। আকবর এই উদারতা গুণেই রাজপুত-রাজগণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে, ভারতে রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে এবং সমগ্র ভারতে সর্ব্ববিধ সুখবর্দ্ধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। সকল ধর্ম্মেতেই সৎ উপদেশ ও সৎ শিক্ষা আছে, যেখান হইতেই হউক তাহা গ্রহণ করিতে হইবে; ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। ঐতিহাসিক ম্যালিসন তাঁহার আকবর নামধেয় পুস্তকে বলেন, "আকবরের এই যে উদারতা ও শাসন পদ্ধতি তাহা ইংরাজগণও বর্ত্তমান-ভারতে বহুল পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন। আকবর বাদসাহের সহিত তদানীন্তনকালের ইউরোপের কোন রাজার তুলনা করিলে, আকবর কিছুতেই ম্লান বা হীনপ্রভ হইবার নহেন"। সাধু-কার্য্যের উপর আকবরের প্রতিষ্ঠা। বলিতে কি যখন ভারতের ঘোর দুর্দিন আসিয়া উপস্থিত, নির্য্যাতন গৃহবিবাদ অরাজকতা যখন সমগ্র

ভারতকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, তখনই ঈশ্বরের মঙ্গল-বিধানে আকবরের মত বাদসাহের অভ্যুদয়। শান্তি ও উদারতা তাঁহার শাসনকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। অসীম রাজ্যের অসংখ্য প্রজা বাদসাহের সুশাসনে শান্তি ও কল্যাণ লাভ করিয়াছিল। ইহা কেবল আমাদের কথা নয়, কিন্তু প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ম্যালিসন ও হণ্টার এই ভাবেই আকবরকে চিত্রিত করিয়াছেন।

আকবরের বিরাট হৃদয়ের নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার মহামূল্য কয়েকটি উক্তির সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। "আমাদের সহিত ঈশ্বরের যে কি এক যোগ রহিয়াছে, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। * * যিনি সৌভাগ্য-বলে আপনার বৃত্তি-নিচয়কে বাহিরের বস্তু হইতে প্রত্যাহার করিতে পারেন, তিনিই ঈশ্বরের অতুলনীয় আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হন।

ভারত-ললনাগণ নদী হইতে জল তুলিয়া কলসীর উপর কলসী মস্তকে স্থাপন করিয়া সঙ্গীগণের সহিত আলাপ করিতে করিতে নিম্নোচ্চ পথ দিয়া অবাধে চলিয়া যায়। সেইরূপ আমাদের আত্মা যদি মদিরার (ঈশ্বরের প্রেমানন্দের) কলস অটলভাবে ধারণ করিতে পারে, তাহার সকল বিপদ অবসান হয়। ললনাগণ কেমন সহজে মস্তকে কলস ধারণ করিয়া থাকে; আমরা ঈশ্বরকে তদপেক্ষা আরও দৃঢ়তার সহিত কি রক্ষা করিতে পারিব না।

সকল প্রকার দুর্নীতি হইতে পৃথিবীতে আত্মরক্ষা করিয়া চলা বড় কঠিন।

যিনি আপনার ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন ও সকলের সহিত সাধু ব্যবহার করেন, তিনিই ধন্য।

দর্শন চর্চ্চায় আমার এতই আনন্দ, যে উহা আমাকে অন্যান্য কর্ত্তব্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চায়। * * আমি এতবড় রাজ্যের অধীশ্বর, এত প্রভুত্ব আমার হস্তে, কিন্তু বুঝিয়াছি, প্রকৃত মহত্ত্ব কেবল ঈশ্বরেরই আদেশ-পালনে। রাজ্যের ভিতরে এত দল এত ধর্ম্ম মত, ইহা দেখিয়া আমি শান্তিহারা হইয়া পড়ি। বাহিরে এত—সম্পদ এত আড়ম্বরের বিকাশ, কিন্তু নিরাশ অন্তর লইয়া কোন্ আনন্দে রাজ্য শাসন করিব! আমি একজন বিচক্ষণ লোক চাই, যিনি আমার মনের সর্ব্ববিধ সংশয়-চ্ছেদ করিতে পারেন।

যদি তেমন এক জন উপযুক্ত লোক পাই, তবে তাহার স্কন্ধে সাম্রাজ্যের গুরুভার অর্পণ করিয়া সরিয়া পড়ি।

সেই সর্ব্বশক্তিমান প্রদাতার নিকট আমার এইমাত্র প্রার্থনা, যখন আমার কার্য্য তাঁহাকে অনুসরণ না করিবে, তিনি যেন আমাকে বিনাশ করেন; আমি আর তাঁহার অসন্তোষের মাত্রা বাড়াইতে চাহি না।

অনেক শিষ্য প্রতিভা বলে গুরুকে অতিক্রম করে, তাই বলিয়া গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার যেন হ্রাস না হয়।

নির্দ্দোষ লোককে হত্যা করিলে, ঈশ্বরের করুণ হস্তেই তাহাকে সঁপিয়া দেওয়া হয়।

হায়! ইতিপূর্ব্বে যদি আমার প্রকৃত জ্ঞানের সঞ্চার হইত, আমি বিবাহ করিতাম না। এতগুলি প্রজা আমার সন্তান, আমার আবার পুত্রের অভাব কোথায়?

রাজার পক্ষে যদি ঈশ্বরের উপাসনার শ্রেষ্ঠ-পন্থা থাকে, তবে তাহা সুশাসনে এবং ন্যায় বিচারে।

বাল্যবিবাহ ঈশ্বরের প্রীতিকর নহে। যে ধর্ম্মে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ, সেখানে বিধ-

বার ভয়ানক যন্ত্রণা। চৌর্য্যে চোরই দোষী; কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ সম্বন্ধে উভয়েই তুল্যরূপে অপরাধী। সুতরাং এ দোষ চৌর্য্যাপরাধ হইতেও গুরুতর"।

নানা কথা।

বিগত ১২ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার বৈশাখী পূর্ণিমায় সন্ধ্যার পরে—মহাবোধীসভার প্রযত্নে কলিকাতায় বুদ্ধদেবের ২৫৩১ বার্ষিক জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ পুণ্যদিনেই ঐ মহাপুরুষ বৌদ্ধত্ব লাভ করেন, ঐ দিনেই তাঁহার পরিনির্ব্বাণ অর্থাৎ মুক্তি বা তিরোভাব ঘটে। সুতরাং ঐ জন্মদিবসই বুদ্ধের ২৪৯৬ বার্ষিক বৌদ্ধত্বলাভের দিন ও ২৪৫১ বার্ষিক তিরোভাব কাল। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেও চট্টগ্রাম ও সিংহলে অনেক বৌদ্ধ আছেন। তাঁহাদের অর্থ-সাহায্যে ও মহামতি ধর্ম্মপালের প্রযত্নে কলিকাতা কপালি-টোলাতে ললিতমোহন দাসের গলিতে একটি বৌদ্ধ-বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ নবনির্ম্মিত গৃহের পূর্ব্বাংশে কক্ষাভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের সমাধিস্থ মূর্ত্তি শুভ্রমর্ম্মর প্রস্তরে বিরাজিত। অর্দ্ধ-শয়ান অবস্থায় মহাপুরুষের দুইচারিটি ক্ষুদ্র প্রস্তর মূর্ত্তিও দেখিলাম। উহা পরিনির্ব্বাণ অর্থাৎ সজ্ঞান অবস্থায় দেহত্যাগ ও মুক্তিলাভ-অবস্থার পরিচায়ক। দেখিলাম, অনেকগুলি বাতির আলোক বেদীর উপরে প্রজ্জ্বলিত, একটি নির্ব্বাণোন্মুখ হইবার পূর্ব্বে আর একটি বাতি তাহার স্থানে বসাইয়া দেওয়া হইতেছে। মধ্যে সভাগৃহ, পশ্চিমে বৌদ্ধ পুরোহিতগণের থাকিবার স্থান। আশ্রমটি ক্ষুদ্র হইলেও পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন। সমাগত উপাসকের মধ্যে অনেক গুলি চট্ট-গ্রামের ও সিংহলের বৌদ্ধ। চট্টগ্রামের একজন বৌদ্ধ-পুরোহিত সভার উদ্দেশ্য বাঙ্গালায় বুঝাইয়া দিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে অংশ বিশেষ উচ্চৈঃস্বরে বলিলে উপস্থিত বৌদ্ধগণ সমস্বরে তাহার পুনরাবৃত্তি করিল। তাহার পর কয়েক জন বৌদ্ধ কর্ত্তৃক ধর্ম্মশাস্ত্র পঠিত হইল। পরিশেষে কলি-কাতার মিরর-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সেন নিজ-লিখিত সুদীর্ঘ বক্তব্য ইরাজি ও বাঙ্গালায় পাঠ করিলেন। তাহার বক্তৃতার সারাংশ এই যে "জাপানীগণ বর্ত্তমানে যে অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়াছেন, নানাবিধ কার্য্য-কলাপে জগৎকে যেরূপ বিমুগ্ধ করিতেছেন, তাহাতে তাহাদের অবলম্বিত বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ রূপে আলোচনা করিবার অবসর আসিয়া উপস্থিত। বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানীগণের জাতীয় চরিত্রগঠনে যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার কাহারও জো নাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম নিরীশ্বর বাদে পূর্ণ নহে; উহা আস্তিক্য ধর্ম্ম; নীতির উচ্চতায় ও মাধুর্য্যের গৌরবে উহা সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম হইবার উপযোগী।" পরে দুই একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদের বক্তব্য কহিলে সভাভঙ্গ হইল। সর্ব্বশেষে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। চট্টগ্রামের বৌদ্ধগণের সেদিনকার সৌজন্য ও বিনয় বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। সেদিন উৎসবক্ষেত্রে ইহাও শুনিলাম যে লক্ষ্ণৌ সহরের সান্নিধ্যে আর একটি বৌদ্ধ-বিহার স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে।

প্রাচীন-নবদ্বীপের সৌভাগ্য সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম বঙ্গদেশে নিতান্ত অপরিচিত ছিল না। গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ যাইতে হইলে স্বরূপগঞ্জ দিয়া যাইতে হয়। স্বরূপগঞ্জের নিকটে উক্ত প্রশস্ত রাজপথের উত্তরভাগে ও সান্নিধ্যে ভগ্নঅট্টালিকার এক ক্ষুদ্র স্তূপ রহিয়াছে। স্থানীয় লোকের মুখে শুনি-য়াছি, ঐ স্থানেই সুবর্ণবিহার নামক এক বৌদ্ধবিহার ছিল। কটকের নিকট ভুবনেশ্বরের বৌদ্ধবিহারের ত কথাই নাই। কালের প্রভাবে একণে সকলই বিপর্য্যস্ত।

সলোমনের নিকট পক্ষীর অভিযোগ। লেফ্‌টনাণ্ট কর্ণেল ফিলট মূল আরব্যভাষা হইতে পক্ষীর অভিযোগ বৃত্তান্ত অনুবাদ করিয়া ১৯০৭। মার্চ্চ মাসের আসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেলে প্রকাশ করিয়াছেন। উপদেশ-পূর্ণ বিধায় উহার সারাংশ নিম্নে সন্নিবেশিত হইল। পক্ষীগণ একদিন সলোমনের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, যে আপনি ঈশ্বরের প্রবক্তা, আপনি আমাদের প্রতি কৃপা করুন। বর্ত্তমানে আমরা ৪ জাতীয় পক্ষীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছি। প্রথম শ্যেনপক্ষী, উহারা মনুষ্যের স্নেহলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে, উহারা উচ্চ আসনে উঠিয়াছে, রাজার হস্ত ভিন্ন অন্যত্র বসিতে চাহে না; গর্ব্বে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আমাদের সহিত কথা কহিতে ঘৃণা বোধ করে। ২য় পেচক, উহারা পরিত্যক্ত ভগ্ন গৃহে বাস করে, বৃক্ষ শাখায় উপবেশন করে না, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আহু আহু শব্দ করিয়া নীরব হয়। ৩য় দাঁড়কাক, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ উহার পরিচ্ছদ, বিষাদব্যঞ্জক তাহার ধ্বনি, লোকালয়ের প্রতি সে বিমুখ, ধ্বংসাবশিষ্ট স্থানে তাহার গতিবিধি। ৪র্থ বুলবুল, শীতে সে নিস্তব্ধ, পৃথিবীর উপরে উপেক্ষা-বিজ-ড়িত তাহার দৃষ্টি, ফলফুলে ধরণী সুশোভিত হইলেই তাহার আমোদ ও সঙ্গীত; ইহারই বা কারণ কি। সলোমন বলিলেন, তোমাদের ত কথা শুনিলাম। উহা-দিগকে ডাকাই, দেখি তাহারা কি বলিতে চায়।

আদেশ মতে শ্যেন পক্ষী আসিয়া উপস্থিত। সলোমন জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তুমি অপর পক্ষীর সহিত কথা কহ না। শ্যেন উত্তর করিল মহাশয়! জিহ্বা হইতে অনেক সময় বাজে কথা বাহির হইয়া পড়ে, কার্য্য করিবার জন্যই সকলের জীবন। যাহারা কর্ম্মবীর তাহারাই ঈশ্বরের প্রিয়, যাহারা বকে অথচ কার্য্য করে না, ঈশ্বর তাহাদের প্রতি বিমুখ। তাই আমি বাক্‌যত। শ্যেন এই বলিয়া বিদায় হইলে পেচক আসিয়া উপস্থিত। জিজ্ঞাসিত হইলে পেচক নিবেদন করিল, পৃথিবীর উপরে যাহারা আস্থাবান তাহারা নিতান্তই প্রতারিত। যে জানে, যে এখানকার কার্য্যাকার্য্যের জন্য পরলোকে গিয়া তাহাকে হিসাব দিতে হইবে,সে ভীত ও বিষন্ন না হইয়া কি রূপে থাকিবে। যাঁহাকে ভয় করি, সেই এক ঈশ্বরের চিন্তাতেই আমি নিমগ্ন। যদি কেহ আমার বন্ধু থাকেন, তবে তিনি। সেই "হু" অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন আর আমার কেহ নাই। তাই "আ হু" বলিয়া তাঁহাকে ডাকি। যাঁহারা তাঁহার প্রেমে আত্মহারা, তাঁহাদের আত্মার ক্ষুধা-শান্তি এক ঈশ্বরে। পেচকের পরে দাঁড়কাক আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিল, মৃত্যু ত সমাগত, লোকে অপরের ঘোর মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখিয়াও নিজে চিন্তাহীন। যেখানে যাই, দেখি শোকের আর্ত্তনাদ উঠিতেছে। মৃত্যুর অত্যাচারে লোক ছিন্নবিচ্ছিন্ন। পৃথিবীর আবার মূল্য কোথায়। সকলেই ত চলিষ্ণু। মনুষ্য বধির,তথাপি পৃথিবী অনবরত চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিতেছে, যে কতলোকের আশারাশি আমি বিনষ্ট করিয়াছি, কত সঞ্চিত ধন-সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত করিয়াছি, কত মৃতদেহ মৃত্তিকা নিম্নে প্রোথিত করিয়াছি; এতকাল ধরিয়া করিয়া আসিতেছি, কিন্তু নির্ম্মম আমি, আমার চক্ষে জল নাই। সর্ব্বশেষে বুলবুল আসিয়া উপস্থিত, বলিল আমি মদিরার আনন্দে চীৎকার করি না। আমি মাতালকে দেখিয়া বিস্ময়ে শব্দ করি। আমি দেখি মদিরার প্রভাবে লোকের ধর্ম্ম বিনষ্ট, জ্ঞানী অজ্ঞানে পরিণত, ভদ্র ভদ্রতাবিরহিত। হায়! মদিরার প্রভাবে পণ্ডিতেরা বাঁদরের মত নৃত্য করে, কুকুরের মত লম্ফ দেয়, অবশেষে শূকরের মত ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হয়, চিরশান্তিময় ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায়, অবিশ্বাসীর উপাধি-চিহ্ন কণ্ঠে ধারণ করে। হায়! তিনিই ধন্য, যিনি সাধু-ইচ্ছার দ্রাক্ষালতা অন্তরে রোপণ করেন, আনন্দের বুকে ঐ লতাকে উঠাইয়া দেন, প্রেমের রস সঞ্চারিত করিয়া উহাকে ফলবান করেন, জ্ঞানা-কাঙ্খার মৃদু-হিল্লোল উহার উপর বহিতে দেন, সুপক্ক হইলে ঐ দ্রাক্ষাফল বিশ্বাসের অঙ্গুলিতে চয়ন করেন, সন্তোষের কুম্ভে উহাকে পচিতে দেন, বিপদের সময়ে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের চক্রে উহাকে নিষ্পেষিত করিয়া উহা হইতে মদিরা বাহির করিয়া সেই অলৌকিক মদিরা পান করেন। সলোমন এই সকল চিন্তাপূর্ণ উক্তি শুনিয়া বিস্মিত হইলেন; সকলকে বলিলেন,শ্যেন পক্ষীর নিরবতা সকলেরই শিক্ষনীয়, পেচক জ্ঞানে সকলকে পরাভব করিয়াছে, দাঁড়কাকের বিলাপ ও নির্জ্জন ভ্রমণের বাস্তবিক কারণ আছে, বুলবুলের মদিরা-ব্যাখ্যা অতীব সঙ্গত। এই বলিয়া পক্ষীগণকে বিদায় করিয়া দিলেন।

বাবি-ধর্ম্ম—১৮৪৬ সালে পারস্য দেশে মির্জ্জা-মহম্মদ আলি নামে জনৈক ধর্ম্ম-সংস্কারক এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার জন্ম সিরাজ নগরে। মহম্মদআলি বাবানামে পরিচিত;—তাঁহার পরবর্ত্তী নেতা 'বেহাউল্ল'র নাম হইতে ইহা বেহাই ধর্ম্ম নামে পরিচিত। এই ধর্ম্মাবলম্বীগণ সকল শাস্ত্র হইতেই সত্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। ইহাদের মত কতক পরিমাণে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরূপ। বাবিগণ ধর্ম্মের জন্য অনেক উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছে। প্রায় ২০ হাজার লোক এই ধর্ম্মের জন্য নিহত হইলেও এই উৎপীড়নে ধর্ম্মের তেজ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে; বর্ত্তমানে পৃথিবীর নানা স্থানের লোক এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। আমেরিকায় প্রায় ১০ হাজার লোক বাবিধর্ম্মালম্বী। সম্প্রতি নিউইয়র্ক নিবাসী একদল প্রচারক নানা স্থানে এই ধর্ম্ম প্রচার করিতে বহির্গত হইয়াছেন। বিগত ৬ই এপ্রিল ইহাদের নেতা শ্রীযুক্ত হুপার হেরিস্ সিটি-কলেজে বাবিধর্ম্মের মত ও ইতিহাস সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন।

নবযুগ। আর্য্যসমাজ হইতে প্রকাশিত আর্য্য-পত্রিকায় প্রকাশ,যে রাজনৈতিক আন্দোলন লইয়া আপামর সাধারণ এতই ব্যতিব্যস্ত যে বিগত দুই বৎসর যাবৎ ধর্ম্ম বিষয়ক পত্রিকা পাঠে লোকের আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছে। এমন কি ইহার জন্য আর্য্য মেসেঞ্জার নামক পত্রের কলেবর হ্রাস করিতে হইয়াছে। সত্য সত্যই বর্ত্তমানে এক ঘোর পরিবর্ত্তনের যুগ আসিয়া উপস্থিত। ইহার উদ্দাম প্রভাবে কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে আজ কাল উদ্দাম নৃত্য ও প্রেমালাপ বড় আর স্থান পাইতেছে না, লোকের চিন্তার গতি যেন অন্যদিকে প্রধাবিত হইয়াছে। কল্পনা-প্রসূত নাটিকার স্থান বাস্তবইতিহাসগত সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম, বঙ্গের শেষ বীর, বঙ্গ-বিক্রম প্রভৃতি গ্রন্থ অধিকার করিয়া বসিতেছে। লেখকের তুলিকায় পরিস্ফুট আমাদের দুর্ব্বলতা বিশ্বাস-ঘাতকতা, পরশ্রীকাতরতার ঘৃণিত মূর্ত্তি দেখিয়া বাঙ্গালী আমরা নিজেই লজ্জায় ঘৃণায় অবনত মস্তক হইতেছি। সে দিন শ্রীমনোমোহন গোস্বামী কর্ত্তৃক

বিরচিত "সমাজ" বলিয়া একখানি গ্রন্থ আমাদের হস্তে আইসে। অভিনয়ের জন্য উহা সংরচিত। বর্ত্তমান সমাজের মধ্যে যে সকল কলঙ্ক আছে ও স্থান পাইতেছে তৎসমস্ত উচ্ছেদ করিয়া শ্লেষের খর-বাণে তাহার নির্ম্মূল সাধন করাই লেখকের অভিপ্রায়। তাই তিনি উপাধি-লোলুপ চরিত্রহীন দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট-কঙ্কালসার-প্রজার উপর নির্ম্মম-প্রকৃতি-জমিদারের, দয়াদাক্ষিণ্যহীন উগ্র প্রকৃতি অর্থগৃধ্নু ডাক্তারের, নৈতিক জীবনবিহীন দলাদলিরত দক্ষিণালোলুপ এমন কি অর্থলোভে পরগৃহে অগ্নিদানসমর্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের, দেশ হিতৈষীর নির্ম্মোকধারী বন্দে মাতরং উচ্চারণকারী চাঁদায় অর্থপ্রার্থী কপট স্বার্থপর যুবকের, সজীব ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। অন্যদিকে উত্থান-যাত্রী পবিত্র-চরিত্র যুবকের জীবনে কিভাবে মলিনতার বীজ অঙ্কুরিত হয়, পরিশেষে চিরপুণ্যময়ী হিন্দুললনার অবিচলিত প্রগাঢ় প্রেম ও সহিষ্ণুতা গুণে কিরূপে বা সেই কলঙ্কিত স্বামী উদ্ধার লাভ করে তাহার ও করুণ চিত্র সকলের সমক্ষে ধারণ করিয়াছেন। এইরূপ পুস্তকের অভিনয় দেখিয়া অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্য দর্শকেরা যে সত্যই চৈতন্য লাভ করিবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহাতে প্রকৃত শিক্ষা হয়, নৈতিক-জীবন বিগঠিত হয়, জীবনের উচ্চ আদর্শ মনে প্রতিভাত হয়, স্বদেশ প্রেম জাগ্রত হয়, এইরূপ পুস্তকের অভিনয়ই আজকাল-কার দিনে বিশেষ আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা রঙ্গমঞ্চের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাঁহাদের যে বিশেষ দায়িত্ব আছে, এ কথা তাঁহারা যেন কস্মিন্‌কালে বিস্মৃত না হয়েন। লোক-রঞ্জনে নহে, কিন্তু শিক্ষাদানেই নাট্যশালার গৌরব ও প্রকৃত সার্থকতা।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৮, বৈশাখ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪০০৸৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৬২২ ৶৯
সমষ্টি	...	৩০২৩ ৵৯
ব্যয়	...	৩৫৯। ৯
স্থিত	...	২৬৬৩৸৵০

জায়

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
পাঁচকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৩০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

৩৬৩৸৵০

২৬৬৩৸৵০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২০৯৲

মাসিক দান।

স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের এষ্টেটের একজীকিউটার মহাশয়গণ

২০০৲

নববর্ষের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটী হইতে প্রাপ্ত

৯৲

২০৯৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১২।৵০
পুস্তকালয়	...	৩।০
যন্ত্রালয়	...	১১৬।⁄০
গচ্ছিত	...	৪২॥০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	১৭॥০
সমষ্টি	...	৪০০৸৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২১৩।০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৩॥ ৩
পুস্তকালয়	...	১৸৵৬
যন্ত্রালয়	...	৯৯॥⁄৯
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	১১৲৩
সমষ্টি	...	৩৫৯। ৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

সুন্দর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের অনুবৃত্তি।

আমাদের শতাব্দীর প্রারম্ভে ফ্রান্সের বিদ্বজ্জনপরিষৎ নিম্নলিখিত প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। "প্রাচীন গ্রীসদেশীয় ভাস্কর-শিল্পের চরম উৎকর্ষের কারণগুলি কি এবং কি উপায়ে ঐ প্রকার চরম উৎকর্ষে উপনীত হওয়া যাইতে পারে?" এই প্রশ্নটির সদুত্তর দিয়া যিনি জয়মাল্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম এমেরিক ডেভিড্। সেই সময়ে যে মতটি প্রবল ছিল সেই মতেরই পোষকতা করিয়া তিনি বলিয়াছেন, শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ঐকান্তিক অনুশীলনেই প্রাচীন ভাস্কর-কলা চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, এবং প্রকৃতির অনুকরণই ঐ প্রকার উৎকর্ষ লাভের একমাত্র পন্থা। কাতরমেয়ার দেকাঁস্যাসি নামক এক ব্যক্তি এই মত খণ্ডন করিয়া মানস-অদর্শগত সৌন্দর্য্যের পক্ষ সমর্থন করেন। সমস্ত গ্রীক ভাস্কর-কলার ইতিহাস এবং তখনকার খ্যাতনামা শিল্প সমালোচকদিগের মন্তব্য আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, প্রকৃতির অনুকরণের উপর কিংবা বাস্তব-আদর্শের অনুকরণের উপর গ্রীকদিগের শিল্প-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বাস্তব-আদর্শ যতই সুন্দর হউক না কেন, তবু তাহা খুবই অপূর্ণ এবং অনেকগুলি বাস্তব-আদর্শের অনুকরণেও একটি অনিন্দ্য সুন্দর মূর্ত্তি কখনই গঠিত হইতে পারে না। প্রাচীন গ্রীকেরা সেই মানস-আদর্শেরই অনুসরণ করিত যাহার প্রতিরূপ বাস্তব জগতে তখনও দেখা যাইত না, এখনও দেখা যায় না।

শিল্পকলা সম্বন্ধে আর একটি মতবাদ প্রচলিত আছে যাহা প্রকারান্তরে অনুকরণ-মতেরই পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকে। এই মতবাদীরা বলেন, বিভ্রম-মোহ উৎপাদন করাই শিল্পকলার উদ্দেশ্য। যে চিত্র-সৌন্দর্য্য চোখে ধাঁদা লাগাইয়া দেয়, তাহাই আদর্শ-সৌন্দর্য্য। যেমন জিউক্সিস নামক চিত্রকরের আঙ্গুর ফলের উৎকৃষ্ট চিত্র। উহা এতটা প্রকৃতির অনুরূপ যে, সত্যিকার আঙ্গুর মনে করিয়া পাখীরা আসিয়া ঠোক্-

রাইত। কোন নাট্যাভিনয়ে যখন কোন দৃশ্য বাস্তব বলিয়া ভ্রম হয় তখনই তাহা কলানৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা বলিয়া পরিগণিত হয়। এই মতবাদের মধ্যে যেটুকু সত্য তাহা এই :—কোন কলারচনা সুন্দর হইতে হইলে তাহাতে জীবন্ত ভাব থাকা চাই। তাহার দৃষ্টান্ত,—নাট্যকলার নিয়ম এই যে, অতীত কালের অপরিস্ফুট ছায়া-মূর্ত্তি সকল নাট্যমঞ্চে প্রদর্শিত হইবে না, পরন্তু কাল্পনিক কিংবা ঐতিহাসিক পাত্রগণ জীবন্ত ধরণের হইবে, আবেগময় হইবে, মানুষের ছায়ার মতন নহে—জীবন্ত মানুষের মত কথা কহিবে, কাজ করিবে। অভিনয়ের ইন্দ্রজাল, মানব-প্রকৃতিকে বিকৃতরূপে প্রদর্শন না করিয়া বরং তাহাকে আরও উন্নত আকারে প্রদর্শন করিবে। এমন কি এই ইন্দ্রজালই, নাট্যকলার মূল-মন্ত্র। এই ইন্দ্রজালই আমাদের দুঃখ-কষ্টকে অপসারিত করে, আমাদিগকে সেই চির-আকাঙ্ক্ষা চির-আশার দেশে লইয়া যায়,—যেখানে বাস্তব জগতের অসম্পূর্ণতা সকল তিরোহিত হইয়া কতকটা পূর্ণতার আবির্ভাব হয়, যেখানকার কথিত ভাষা আরও উন্নত, যেখানকার ব্যক্তিগণ আরও সুন্দর, যেখানে কদর্য্যতার অস্তিত্বই স্বীকৃত হয় না; —অথচ সেই অভিনয়ের ইন্দ্রজাল ইতিহাসের মর্য্যাদা অতিক্রম করে না, এবং মানব প্রকৃতির যে সকল অকাট্য নিয়ম তাহারও বাহিরে যায় না। শিল্পকলা যদি মানুষকে অতিমাত্র বিস্মৃত হয় তাহা হইলে সে তাহার উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে—তাহার গম্য-পথে কখনই উপনীত হয় না, সে এমন কতকগুলা অলীক বস্তু সৃষ্টি করে যাহার প্রতি আমাদের চিত্ত কিছুতেই আকৃষ্ট হয় না। আবার যদি শিল্পকলা বেশীমাত্রায় মানুষ-ঘেঁসা হয়, বেশীমাত্রায় বাস্তব হইয়া পড়ে, বেশীমাত্রায় নগ্নতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে সে তাহার গম্য-স্থানের এ-ধারেই থাকিয়া যায়—আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে না।

বিভ্রম উৎপাদন শিল্পকলার প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে, কেন না কোন কলা-রচনা সম্পূর্ণরূপে বিভ্রম উৎপাদন করিতে পারিলেও তাহা চিত্তাকর্ষণ না করিতেও পারে। আজকাল বিভ্রম উৎপাদন করিবার উদ্দেশে, নাট্যমঞ্চে পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্যতা রক্ষার জন্য প্রভূত চেষ্টা হইয়া থাকে; কিন্তু আসলে উহাতে কিছুই যায়-আসে না। নাট্যাভিনয়ে, যে ব্রুটাসের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, সে যদিও প্রাচীন রোমক বীরের পরিচ্ছদ পরিধান করে, এমন কি, যে ছোরা দিয়া সীজারকে বধ করা হইয়াছিল ঠিক সেই ছোরাখানা অভিনয়-কালে ব্যবহার করে—তথাপি, উহা প্রকৃত সমজদারের মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারে না। আরও এক কথা;—বিভ্রম-মোহ বেশীমাত্রায় উৎপাদন করিলে, শিল্পকলার রসটি মরিয়া যায়, এবং প্রাকৃতিক বাস্তবতা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। এইরূপ বাস্তবতা কখন কখন অসহ্য হইয়া উঠে। যদি আমার বিশ্বাস হয়, আমার অনতিদূরে, এফিজেনির পিতা এফিজেনিকে সত্য সত্যই বলি দিতেছে, তাহা হইলে আমি ভয় আতঙ্কে কাঁপিতে কাঁপিতে নাট্যশালা হইতে বাহির হইয়া পড়ি।

কিন্তু এইরূপ প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয়, —করুণা ও ভয়ানক রস উদ্রেক করাই কি কবির উদ্দেশ্য নহে? হাঁ, গোড়ায় কতকটা তাহাই উদ্দেশ্য বটে; কিন্তু তাহার পর, উহাতে আর একটা রস মিশ্রিত করিয়া উহার তীব্রতা কমান হইয়া থাকে। চূড়ান্ত

পরিমাণে করুণা ও ভয়ানক রস উদ্রেক করাই যদি নাট্যকলার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির নিকট শিল্প-কলাকে হার মানিতে হয়—এই বিষয়ে শিল্পকলা, প্রকৃতির অক্ষম প্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা বাস্তব জীবনে প্রতিদিন যে সকল শোচনীয় দৃশ্য সচরাচর দেখিয়া থাকি, তাহার নিকট নাট্য-মঞ্চে প্রদর্শিত দুঃখ কষ্ট নিতান্ত লঘু বলিয়াই মনে হয়। কোন একটা প্রধান হাসপাতালে যে সব করুণ ও ভীষণ দৃশ্য দেখা যায়, সমস্ত নাট্যশালা মিলিয়া তাহা দেখাইতে পারে না। যে মতটি আমরা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিতেছি সেই মতের অনুসরণ করিতে হইলে, কবি কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন? তিনি যতদূর পারেন রঙ্গমঞ্চে বাস্তবতার অবতারণা করিবেন, এবং ভীষণ দুঃখ কষ্টের দৃশ্য আনিয়া আমাদের হৃদয়কে ব্যথিত ও কম্পিত করিয়া তুলিবেন। করুণারস উদ্রেক করিবার প্রধান উপায়—মৃত্যু-দৃশ্যের অবতারণা। পক্ষান্তরে হৃদয় বেশী-মাত্রায় উত্তেজিত হইলে, শিল্পকলার রসভঙ্গ হয়। তাহার দৃষ্টান্ত;—ঝটিকা-দৃশ্যের কিংবা ভগ্নতরী-দৃশ্যের যে সৌন্দর্য্য সে সৌন্দর্য্যটি কি? প্রকৃতির এই সকল মহান দৃশ্যের প্রতি আমরা কিসে এত আকৃষ্ট হই? ইহা নিশ্চিত, করুণা কিংবা ভয়ে আকৃষ্ট হই না। এই দুই তীব্র ও মর্ম্মভেদী ভাব বরং ঐরূপ দৃশ্য হইতে আমাদিগকে পরাঙ্মুখ করে। করুণা কিংবা ভয় ছাড়া আর একটি রসের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা ঐরূপ দৃশ্য দেখিবার জন্য তীরে দাঁড়াইয়া থাকি। ইহা নিছক সৌন্দর্য্য রস ও গাম্ভীর্য্যরস। সম্মুখের গম্ভীর দৃশ্য, সমুদ্রের বিশালতা, ফেনময় উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গ, বজ্রের গম্ভীর নির্ঘোষ,—এই ভাবকে উদ্দীপ্ত করে। তখন কি আমরা মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবি যে কতকগুলি হতভাগ্য লোক কষ্ট পাইতেছে, কিংবা তাহাদের মৃত্যু আসন্ন? তাহা যদি ভাবিতাম তাহা হইলে ঐরূপ দৃশ্য আমাদের অসহ্য হইয়া উঠিত। শিল্পকলা সম্বন্ধেও এই-রূপ। যে কোন ভাবেই আমরা উত্তেজিত হই না কেন, সেই ভাবটিকে সৌন্দর্য্যরসের দ্বারা একটু আর্দ্র করা চাই, উহাকে সৌন্দর্য্যরসের অধীনে রাখা চাই। যদি কোন কলা-রচনা, একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা ছাড়াইয়া কেবল করুণা ও ভয়ানক রসের উদ্রেক করে, বিশেষত শারীরিক করুণা ও শারীরিক ভয়ের উদ্রেক করে, তাহা হইলে আমরা উহার প্রতি বিমুখ হই—উহার প্রতি আর আকৃষ্ট হই না।

আর একদল আছেন, তাঁহারা সৌন্দর্য্যকে ধর্ম্মভাব ও নৈতিক ভাবের সহিত এক করিয়া ফেলেন, শিল্পকলাকে ধর্ম্ম ও নীতির সেবায় নিযুক্ত করেন। তাঁহারা বলেন, আমাদিগকে ভাল করিয়া তোলা,—আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে উন্নীত করাই শিল্প কলার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে একটা মুখ্য প্রভেদ আছে। যদি সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যেই নৈতিক সৌন্দর্য্য নিহিত থাকে, যদি সৌন্দর্য্যের আদর্শ ক্রমাগত অনন্তের অভিমুখেই উত্থিত হয়, তবে যে শিল্পকলা সেই আদর্শ-সৌন্দর্য্যকে পরিব্যক্ত করে, সেই শিল্পকলাও মানব আত্মাকে অনন্তের দিকে—অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে উন্নীত করিয়া তাহাকে বিমল করিয়া তোলে সন্দেহ নাই। অতএব শিল্পকলা মানব-আত্মার উৎকর্ষ সাধন করে বটে, কিন্তু পরোক্ষ ভাবে। যে তত্ত্বদর্শী কার্য্যকারণের তত্ত্বানুসন্ধান করেন, তিনিই জানেন যে, শিল্পকলা

সৌন্দর্য্যেরই চরমতত্ত্ব এবং শিল্পকলার প্রভাব পরোক্ষ ও দূরবর্ত্তী হইলেও উহা ধ্রুবনিশ্চিত। কিন্তু কলাগুণীর নিকট সর্ব্বাগ্রে শিল্পকলাই অনুশীলনের বিষয়। যে ভাবরসে তাঁর চিত্ত ভরপুর, সেই ভাবরস তিনি অন্য দর্শকের মনেও উদ্রেক করিতে চেষ্টা পান। তিনি বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যরসের নিকটেই আত্মসমর্পণ করেন, তিনি সেই সৌন্দর্য্যকে সমস্ত বিভূতির দ্বারা, মানস-আদর্শের সমস্ত 'মোহিনী'র দ্বারা আবৃত করিয়া তাহাকে সংরক্ষিত করেন। তাহার পর সেই সৌন্দর্য্যই তাঁহার রচনাকে গড়িয়া তোলে; কতকগুলি বাছা-বাছা লোকের মনে সৌন্দর্য্যরসের উদ্রেক করিতে পারিলেই তাঁহার কার্য্য সিদ্ধ হয়। এই বিমল ও নিস্বার্থ সৌন্দর্য্যের ভাবই ধর্ম্মভাবের ও নৈতিকভাবের পরম সহায়; এই সৌন্দর্য্যের ভাবই ধর্ম্ম ও নীতির ভাবকে উদ্বোধিত করে, পরিপুষ্ট করে, বিকসিত করে, কিন্তু তথাপি এই সৌন্দর্য্যের ভাব একটি পৃথক ভাব—একটি বিশেষ ভাব। এমন কি, যে শিল্পকলা এই সৌন্দর্য্যভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, সৌন্দর্য্যের দ্বারা উদ্দীপিত, সৌন্দর্য্যের দ্বারা পরিব্যাপ্ত—সেই শিল্পকলারও একটা স্বতন্ত্র শক্তি আছে। যদিও শিল্পকলা ধর্ম্মের সহচর, নীতির সহচর, যাহা কিছু মানব-আত্মাকে উন্নত করে তাহারই সহচর, তথাপি শিল্পকলা আপনার নিজস্ব শক্তি হইতেই সমুদ্ভূত।

শিল্পকলার জন্য স্বাধীনতার দাবী, নিজস্ব মর্য্যাদার দাবী, বিশেষ উদ্দেশ্যের দাবী করিতেছি বলিয়া কেহ না বুঝেন, আমরা উহাকে ধর্ম্ম হইতে, নীতি হইতে, দেশানুরাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছি। শিল্পকলা যেরূপ স্বকীয় গভীর উৎস হইতে—সেইরূপ চির-উদ্ঘাটিত প্রকৃতির নিকট হইতেও ভাবরস আকর্ষণ করে। কিন্তু এ কথাও সত্য,—কি শিল্পকলা, কি রাষ্ট্র, কি ধর্ম্ম—ইহাদের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন অধিকার আছে, বিশেষ-বিশেষ কার্য্যশক্তি আছে; ইহারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে, কিন্তু কেহ কাহারও অধীন নহে; উহাদের মধ্যে কেহ যদি স্বকীয় উদ্দেশ্য হইতে বিচলিত হয়,—অমনি সে পথভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়; যদি শিল্পকলা অন্ধভাবে, ধর্ম্মের সেবায়—মাতৃভূমির সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়—সে তাহার মোহিনীশক্তি হারায়—তাহার প্রপ্রভুত্ব হারায়।

ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের সহিত শিল্পকলা কিরূপ মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে তাহার স্বার্থক দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রায়ই পুরাতন গ্রীস ও আধুনিক ইটালীর উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের সহিত শিল্পকলার মিলনের কথা যদি বল—তাহা খুবই সত্য; কিন্তু যদি বল, শিল্পকলা উহাদের দাস, তবে সে কথা নিতান্তই মিথ্যা। শিল্পকলা ধর্ম্মের দাসত্বে নিযুক্ত হয় নাই তাহার প্রমাণ, উহা ধর্ম্মের সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলিকে অল্পে অল্পে নিজ প্রভাবে রূপান্তরিত করিয়াছে;—স্বাধীন ভাবে উহাদের রূপ প্রকটিত করিয়া কিয়ৎপরিমাণে উহাদের মূল ভাবেতেও পরিবর্ত্তন আনিয়াছে।

আবার বলিতেছি, আমরা যেন কিছুই অতিরঞ্জিত না করি। শিল্পকলা, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র,—পরস্পরের সহিত মিলিত হইলেও, উহাদের প্রত্যেকের স্বাধীনতা কখনই নষ্ট হয় না। ইহা মনে করিও, শিল্পকলা নিজেই একপ্রকার ধর্ম্ম। সত্যের ধারণার দ্বারা, মঙ্গলের ধারণার দ্বারা, সুন্দরের ধারণার দ্বারাই ঈশ্বর আমাদের নিকট

আত্মপ্রকাশ করেন। এই তিনটি ধারণাই সমান,—তিনটিই একই পিতার বৈধ সন্তান। উহারা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের অভিমুখে লইয়া যায়, কেন না প্রত্যেকেই ঈশ্বর হইতে প্রসূত। আদর্শ-সৌন্দর্য্যই প্রকৃত সৌন্দর্য্য এবং আদর্শ সৌন্দর্য্যই অসীমের প্রতিবিম্ব। এইরূপে শিল্পকলাও আসলে ধর্ম্ম ও নীতিমূলক। কেননা, শিল্পকলার নিজস্ব ধর্ম্ম ও নিজস্ব প্রতিভা অক্ষুণ্ণ থাকিলে, শিল্পকলা নিজ রচনার মধ্যে অনন্ত সৌন্দর্য্যকেই প্রকাশ করিয়া থাকে। ভৌতিক শৃঙ্খলের অকাট্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া অচেতন প্রস্তরের উপর, অনিশ্চিত ও অস্থায়ী শব্দসমূহের উপর, সসীম-অর্থযুক্ত বাক্যের উপর রচনার ভিত্তি স্থাপন করিয়া, এক একটা বিশেষ ইন্দ্রিয়ের উপযোগী করিয়া, শিল্পকলা ঐ সকল প্রস্তর ও শব্দাদিকে এক একটা সুনির্দ্দিষ্ট আকার প্রদান করে; এবং আত্মাকে উদ্বোধিত করিয়া, কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া, উহাদিগকে একটা রহস্যময় ভাবে অনুপ্রাণিত করে; বাস্তবতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, উহাদিগকে একটা অজ্ঞাত রাজ্যের মধ্যে লইয়া যায়। কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, কি মূর্ত্তি, কি গীত, কি বাক্য,যে আকারেই হউক, কি সুন্দর কি গম্ভীর যে ধরণেরই হউক, শিল্পরচনামাত্রই, মানব-চিত্তে একটা চিন্তাপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত করিয়া আত্মাকে অনন্তের অভিমুখে উন্নীত করে। কল্পনা কিংবা জ্ঞানের পক্ষে ভর দিয়া আত্মা অনন্তের দিকেই উড়িতে চাহে—কি সুন্দরের পথ দিয়া, কি মঙ্গলের পথ দিয়া, আত্মা সেই একই গম্য স্থানে যাইতে চাহে। যে চিত্তবৃত্তি সুন্দরকে উদ্বোধিত করে সেই চিত্তবৃত্তি মানব আত্মাকে ফিরাইয়া ঐ অনন্তের দিকেই লইয়া যায়। শিল্পকলাই এই শুভকরী চিত্তবৃত্তিকে মনুষ্যের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে।

পদার্থের মূল উপাদান।

নিউটন্ কর্ত্তৃক মহাকর্ষণের (Gravitation) নিয়মাবিষ্কার, এবং ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ এই দুইটিই বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বপ্রধান আবিষ্কার বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। এই দুইয়ের পর ছোট বড় অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানা গেছে এবং জড়-বিজ্ঞানের নানা শাখাপ্রশাখা নানা প্রকারে উন্নত হইয়াছে, কিন্তু প্রসারণে কোনটিই নিউটন্ ও ডারুইনের আবিষ্কারের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান যুগের খণ্ড খণ্ড নানা আবিষ্কার মানুষের শত শত আবশ্যক ও অনাবশ্যক কাজে লাগিয়া, বিজ্ঞানের ঘরাও দিক্‌টাকে সুস্পষ্ট করিয়াছে সত্য, কিন্তু জগদীশ্বরের প্রকৃত মহিমা নিউটন্ ও ডারুইনই আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। অনন্ত আকাশের সহস্র সূর্য্যোপম প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া পদতল-লুণ্ঠিত অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ বস্তুমাত্রেই বিধাতার যে মহা নিয়মের শাসনে নিয়ন্ত্রিত হইয়া সর্ব্বদা চলা-ফেরা করিতেছে, তাহার পরিচয় আমরা কেবল নিউটনের আবিষ্কারে জানিতে পারি। পুরুষপরম্পরায় জীব-রাজ্যের অধিবাসী হইয়াও, বিধাতা যে নিয়মে তাঁহার এই বৃহৎ রাজ্যটিকে শাসনে রাখিয়াছেন, তাহা আমরা ভাল বুঝিতাম না, বৈজ্ঞানিকবর ডারুইন্ অভিব্যক্তিবাদ প্রচার করিয়া বিশাল জীব-রাজ্যের শাসনতন্ত্রের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছিলেন। সম্প্রতি নিউটন ও ডারুইনের সিদ্ধান্তের ন্যায় আর একটি মহাবিষ্কার আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি

আকর্ষণ করিয়াছে। ইহাতে জড়তত্ত্বের মূল ব্যাপারের সন্ধান পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

এই নূতন সিদ্ধান্তটির আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, বৈজ্ঞানিকগণ এখন জড়তত্ত্বসম্বন্ধে কি মত পোষণ করেন, তাহা মনে রাখা আবশ্যক। আজকাল জড়ের গোড়ার খবর জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকদিগের শরণাপন্ন হইলে, তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলেন, এই জগতে মোটে ৭০ বা ৮০টি মূল পদার্থ আছে এবং ইহাদেরি বিচিত্র সম্মিলনে জগতে নানাজাতীয় বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে। জল-বায়ু পত্রপুষ্প তৃণ মৃত্তিকা প্রভৃতি পদার্থমাত্রকেই পরীক্ষা করিলে, তাহাতে ঐ কয়েকটি মূল পদার্থ ব্যতীত অপর কোনও জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায় না। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাল্টন্ (Dalton) এই সিদ্ধান্তটির প্রবর্ত্তক। ইনি পূর্ব্বোক্ত ৭০টি মূল পদার্থের অতি সূক্ষ্মকণাকে পরমাণু (Atom) সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন এবং সত্তর জাতীয় মূল পদার্থের সত্তর প্রকার পরমাণুই যে সৃষ্টির মূল-উপাদান তাহাই ইঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল।

বৈজ্ঞানিকগণ সহস্র চেষ্টায় ঐ পরমাণুগুলির বিশ্লেষ করিতে পারেন নাই এবং প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাতেও উহাদের কোন রূপান্তর দেখিতে পান্ নাই। কাজেই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন,—জড়ের মূল উপাদান অর্থাৎ পরমাণুগুলির বিয়োগ নাই এবং কোনও স্বাভাবিক বা কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় তাহাদের একটিরও কোনই পরিবর্ত্তন হয় না; সৃষ্টির সময় তাহাদের প্রত্যেকের সংখ্যা যতগুলি ছিল, আজও ঠিক্ তাহাই রহিয়াছে, পরমাণুর নূতন সৃষ্টি বা ধ্বংস একেবারে অসম্ভব।

প্রাকৃতিক ব্যাপারের ঠিক্ গোড়ার খবর দেওয়া বড় কঠিন; স্থূল কথায় বলিতে গেলে, এপর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিকই কোন প্রাকৃতিক ব্যাপারেরই মূল-রহস্যের মীমাংসা করিতে পারেন নাই। রহস্যোদ্ভেদের জন্য কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সকলকেই ফিরিতে হইয়াছে। প্রকৃতির কর্ম্মশালার রহস্য-যবনিকা যে কোন কালে মানব প্রচেষ্টায় উত্তোলিত হইবে, তাহারো আশা নাই। সুতরাং জগৎ-রচনার প্রারম্ভে যে কি প্রকারে মৌলিক জড় পরমাণুগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ডাল্টন্ সাহেব কোন কথাই বলিতে পারেন নাই।

ডাল্টনের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটি প্রচারিত হইলে, বৈজ্ঞানিকগণ সে'টিকেই জড়তত্ত্বের মূল ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং অদ্যাপি তাহার সত্যতায় সন্দিহান হইবার কোনও কারণ হয় নাই; কিন্তু সম্প্রতি যে এক নূতন সিদ্ধান্তের কথা শুনা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় ডাল্টনের পারমাণবিক সিদ্ধান্তের ভিত্তি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

নব-সিদ্ধান্তিগণ বলিতেছেন, আমরা এপর্য্যন্ত মূল পদার্থের যে সকল অতি সূক্ষ্মকণাকে অবিভাজ্য ও চিরস্থির ভাবিয়া পরমাণু বলিয়া আসিতেছিলাম, সে গুলি প্রকৃতপ্রস্তাবে পদার্থের চরম সূক্ষ্ম অংশ নয় এবং তাহাদিগকে অবিভাজ্যও বলা যায় না। পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ইলেক্ট্রন্ (Electron) নামক যে এক প্রকার পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাকেই তাঁহারা পরমাণু বলিতে চাহিতেছেন। ডাল্টন্ সাহেব যাহাদিগকে পরমাণু বলিতেছেন, তাহার প্রত্যেকটিরই ভিতরে শত সহস্র ইলেক্ট্রন্ ধরা পড়িয়াছে। পৃথিবী মঙ্গল বুধ ও শুক্রাদি জ্যোতিষ্ক যেমন সীমাবদ্ধ স্থানে থাকিয়া সৌরজগতের রচনা

করিয়াছে, বহুসংখ্যক ইলেক্ট্রন্ সেই প্রকারে পুঞ্জীভূত হইয়া এক একটি পরমাণুর সৃষ্টি করে। তা'ছাড়া সৌরজগতস্থ প্রত্যেক জ্যোতিষ্কের যেমন এক একটি নির্দ্দিষ্ট গতি আছে, পরমাণুর গর্ভস্থ ইলেক্ট্রন্‌গুলিরও সেই প্রকার বিচিত্র গতি দেখা গিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ডাল্টন্ সাহেব প্রত্যেক মূল পদার্থেরই এক এক জাতীয় বিশেষগুণসম্পন্ন পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গেছেন। নব-সিদ্ধান্তিগণ ইহা স্বীকার করিতেছেন না। ইহাঁরা দেখিয়াছেন, নবাবিষ্কৃত পরমাণু অর্থাৎ ইলেক্ট্রন্‌মাত্রেরই আকার প্রকার অবিকল এক। ইহারা যখন বিভিন্ন সংখ্যায় জোট বাঁধে, তখন সংখ্যা হিসাবে তাহাদের প্রত্যেক দল এক এক বিশেষগুণসম্পন্ন হইয়া পড়ে এবং এই দলগুলিই আমাদের চিরপরিচিত নানাজাতীয় পরমাণু। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, কয়েক শত ইলেক্ট্রন্ জোট্ বাঁধিলেই একটি হাইড্রোজেন-পরমাণু উৎপন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু রেডিয়ম্ (Radium) নামক ধাতুর একটিমাত্র পরমাণু উৎপন্ন করিতে লক্ষ লক্ষ ইলেক্ট্রনের সম্মিলন আবশ্যক হয়।

বিজ্ঞানের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, কোন মহান্ আবিষ্কার এপর্য্যন্ত একজন পণ্ডিতের জীবনের গবেষণায় সুসম্পন্ন হয় নাই। সকল স্থলেই দেখা যায়, বহুকালের বহু পণ্ডিতের সুদীর্ঘ সাধনার ফল পুঞ্জীভূত হইয়া, এক একটি বৃহৎ আবিষ্কারে পরিণত হইয়াছে। প্রায় দু-হাজার বৎসর ধরিয়া নানা দেশের নানা পণ্ডিত কাব্য কবিতা ও দর্শনে যে মহা সত্যের আভাস দিয়া গেছেন, তাহাই ডারুইনের হস্তে পড়িয়া অভিব্যক্তিবাদে পরিণত হইয়াছিল। লা-প্লাস্ প্রমুখ প্রাচীন পণ্ডিতগণ গ্রহ উপগ্রহাদির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে সত্যের আভাস পাইয়াছিলেন, নিউটন্ তাহাকেই সম্মুখে পাইয়া, তাঁহার মহাবিষ্কারটি সুসম্পন্ন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। আলোচ্য মহাবিষ্কারটিতেও সেই প্রকার নানা দেশের নানা পণ্ডিতের কীর্ত্তিচিহ্ন দেখা যায়। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর গত হইল, অধ্যাপক টম্‌সন্ এই ব্যাপারটির গবেষণার সূত্রপাত করেন এবং তাহার দশ বৎসর পরে সুবিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক বেকেরেল Bacquerel সাহেব ঐ সূত্রে তৎসংক্রান্ত অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া, গবেষণার পথ সরল করিয়া তোলেন। ইনিই ইউরেনিয়ম্ uranium নামক একটি ধাতু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, ইহার সম্মুখে ফোটোগ্রাফের কাচ রাখিলে, আলোকে উন্মুক্ত থাকিলে কাচে যেমন দাগ পড়ে,এখানেও ঠিক সেই প্রকার দাগ পড়িয়াছিল। ইহা হইতে বেকেরেল সাহেব ঠিক করিয়াছিলেন, ইউরেনিয়ম্ হইতে আমাদের অদৃশ্যে নিশ্চয়ই কোন প্রকার তেজ নির্গত হয় এবং তাহাই কাচের উপর পড়িয়া ফোটোগ্রাফের প্রলেপকে বিকৃত করিয়া তোলে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক কুরি সাহেবের * নাম পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। ইহাঁর সহধর্ম্মিণী বর্ত্তমান যুগের একজন বড় বৈজ্ঞানিক। এই পণ্ডিতা রমণী বেকেরেল্ সাহেবের আবিষ্কারে বিস্মিত হইয়া অবিশুদ্ধ আকরিক ইউরেনিয়ম্ লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ইউরেনিয়ম্ ছাড়া রেডিয়ম্ নামক একটি অপরিজ্ঞাত ধাতুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল এবং বৈ-

* অল্পদিন হইল এই প্রবীণ পণ্ডিতটির মৃত্যু হইয়াছে। পারিস্ সহরের রাজপথে গাড়িচাপা পড়িয়া ইহার মৃত্যু হয়।

জ্ঞানিকগণ ইহার অত্যাশ্চর্য্য গুণ দেখিয়া অবাক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অদ্ভুত ধাতুটিই আজ রসায়নশাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিতে বসিয়াছে।

রেডিয়ম্‌কে এপর্য্যন্ত অবিমিশ্র অবস্থায় পাওয়া যায় নাই। পরিমাণেও ইহাকে অধিক সংগ্রহ করা যায় নাই, বহুচেষ্টাতে এক একবারে এক গ্রেণের অধিক রেডিয়ম্ কেহই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই কণাপ্রমাণ অবিশুদ্ধ জিনিসটির যে সকল কার্য্য দেখা যায়, তাহা বড়ই বিস্ময়কর। অধ্যাপক বেকেরল্ ইউরেনিয়ম্ হইতে, একপ্রকার তেজঃ নির্গত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রেডিয়ম্ হইতে তিন রকমের রশ্মিনির্গমন সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছিল। এই তিনটির প্রথমটিকে বৈজ্ঞানিকগণ ক-রশ্মি (Alpha-rays) নামে অভিহিত করিয়াছেন। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল, ইহা হেলিয়ম্* (Helium) নামক একপ্রকার ধাতুর অণুময় প্রবাহ ব্যতীত আর কিছু নয়। দ্বিতীয়টিতে ও অর্থাৎ খ-রশ্মিতে (Beta-rays) আর একপ্রকারের অতি সূক্ষ্ম অণুর অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছিল। গ-রশ্মিতে (Gamma-rays) অণুপ্রবাহের লক্ষণ দেখা যায় নাই। পরীক্ষায় স্থির হইয়াছিল, ইহা সাধারণ রন্‌জেন্ রশ্মির ন্যায়, কোন প্রকার আলোকের তরঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

রেডিয়মের অতি সূক্ষ্মকণা হইতে ঐ প্রকারে হেলিয়ম্ নামক একটি সম্পূর্ণ পৃথক মূলপদার্থের উৎপত্তি দেখিয়া এবং খ-রশ্মিতে পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর অণুর প্রবাহ লক্ষ্য করিয়া, ডাল্‌টনের পারমাণবিক সিদ্ধান্ত যে অযৌক্তিক তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। স্থির হইল,—পরমাণু অবিভাজ্য নয়, এবং ইহা ইলেক্‌ট্রন্ নামক কতকগুলি অতিসূক্ষ্ম অণুর সমষ্টি মাত্র। রেডিয়ম্ যেমন হেলিয়মে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই প্রকার যে-কোন পদার্থের পরমাণু তাহার মধ্যস্থ ইলেক্ট্রন্ প্রক্ষেপ করিয়া, পদার্থান্তরের পরমাণুতে রূপান্তরিত হইতে পারে। আমরা এপর্য্যন্ত যে সকল বস্তুকে মূলপদার্থ বলিয়া আসিতেছিলাম, তাহারা মূল পদার্থ নয়। জগতে মূল পদার্থ একক ইলেক্ট্রন্‌ই; ইহাই একমাত্র পরমাণু। হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন, লৌহতাম্রাদি ধাতব পদার্থের যে সকল সূক্ষ্ম অংশকে আমরা পরমাণু বলিয়া আসিতেছিলাম, তাহারা ঐ এক ইলেক্ট্রনেরই বিচিত্র বিন্যাসে উৎপন্ন।

এই আবিষ্কার সমাচার প্রকৃতই উপকথার ন্যায় বলিয়া বোধ হয়। ডাল্‌টনের পারমাণবিক সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতার কথা পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেও কাহারো মনে উদিত হয় নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের ইহা একটি মহাকীর্ত্তি বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। শুনিয়াছিলাম, অতিপ্রাচীনকালের রসায়নবিদ্‌গণ "পরশ-পাথরের" সন্ধানে ঘুরিতেন; লৌহকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করাই ঐ সকল পণ্ডিতদিগের চরম-লক্ষ্য ছিল। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের সমস্ত শ্রমই ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছিল।—"পরশ-পাথর" মিলে নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সেই "পরশ-পাথরে"রই সন্ধান পাইয়াছেন। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রদারফোর্ড্ (Rutherford) সাহেব দেখাইয়াছেন, রেডিয়ম্-কণা ইলেক্ট্রন্ ছাড়িতে

---

* গত ১৮৯৫ সালে অধ্যাপক রাম্‌জে (Ramsay) এই ধাতুটির আবিষ্কার করেন। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ইহার অস্তিত্ব দেখা যায় নাই। রশ্মি-নির্ব্বাচন-যন্ত্র (spectroscope) দিয়া সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কেবল সূর্য্যমণ্ডলেই ইহার অস্তিত্বলক্ষণ দেখা গিয়াছিল।

ছাড়িতে শেষে সীসকে পরিণত হইয়া পড়ে। সুতরাং লৌহকণায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ইলেক্ট্রন্ সংযুক্ত হইলে, সেটি যে স্বর্ণে পরিণত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু কোন্ শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া ইলেক্ট্রন্‌গুলি সে গুলিকে এক সঙ্কীর্ণ গণ্ডী'র ভিতর পরিভ্রমণ করাইয়া নানা পদার্থের পরমাণু রচনা করে, তাহা আজও রহস্যাবৃত রহিয়াছে। মানুষের সসীম বুদ্ধি যে, কোন কালে সেই অসীম শক্তির ভাণ্ডারের সংবাদ বহিয়া আনিতে পারিবে, তাহার আশা নাই। মানুষকে চিরদিনই সেই অসীমের পাদমূলে মাথা নোয়াইয়া থাকিতে হইবে। তাই মনে হয়, অধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ "পরশ পাথরে"র সন্ধান পাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাকে করতলগত করিবার সামর্থ্য বোধ হয় তাঁহাদের কোন কালেই হইবে না।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে আচার্য্যের উপদেশের সারাংশ।

অপৌত্তলিক উপাসনা।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান চারিটি লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ১ম অপৌত্তলিক ব্রহ্মোপাসনা, ২য় গৃহে গৃহে পরিবারের মধ্যে ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা, ৩য় ব্রহ্মের সহিত জীবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, অন্য কথায় মধ্যবর্ত্তিত্বের অভাব, ৪র্থ শাস্ত্র কোন গ্রন্থ বিশেষে বদ্ধ নহে,মানব প্রকৃতিমূলক সারসত্যই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র। আমরা ব্রাহ্ম হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে সর্ব্বস্রষ্টা পরব্রহ্মরূপে সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না—এই প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক আমরা যেন পৌত্তলিক উপাসনা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করি। ব্রাহ্মগণ! তোমরা সত্যের অবমাননা করিয়া অসত্যকে বরণ করিও না। সত্যকে আপনার মনের মতন গড়িয়া লইও না—আত্মাকে সত্যের প্রতি উন্নত কর। যিনি "দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ" তাঁহার আসনে উপদেবতা সকলকে স্থাপন করিও না। অসীমকে সসীমভাবে উপাসনার কুফল অবশ্যম্ভাবী; উহা হইতেই আমাদের আধ্যাত্মিক দুর্গতি ও অবনতি। এই কারণেই বর্ত্তমানে কতকগুলি বাহ্যিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বসাক্ষী ভূমা পরমেশ্বরকে বন্দিশালায় আনিয়া তাঁহার উপাসনা মৌখিক বাহ্য ক্রিয়াতে পরিণত করিয়াছি, আত্মা ও পরমাত্মার আন্তরিক সহবাস চলিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন—আমরা প্রস্তরখণ্ডকে দেবতা বলিয়া আরাধনা করি না, অনন্তের স্মরণচিহ্ন ভাবিয়াই তাহার পূজা করি। কিন্তু তাহার ফল এই হয় যে, যাহা স্মৃতিচিহ্ন মাত্র, কালে তাহাই দেবতা হইয়া দাঁড়ায়—নকল ও আসল একীভূত হইয়া যায়। ইহা অবশ্যম্ভাবী। যাহা স্মরণচিহ্নমাত্র, তাহাতেই আমরা দেবত্ব আরোপ করিয়া বসি, তাই এক ঈশ্বরের আসনে অসংখ্য অগণ্য দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অবশেষে এতই দুর্গতি হইয়া পড়িয়াছে, যে বসন্ত প্রভৃতি রোগের বিভিন্ন দেবতা কল্পনা করিতে কুণ্ঠিত হই-নাই।

কেহ কেহ বলেন যে মনুষ্য নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনায় অক্ষম সুতরাং মূর্ত্তিপূজা ভিন্ন আর গতি নাই, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। দৃষ্টান্ত—ইহুদী, মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায়। তাহাদের ইতিহাসে কি দেখা যায়? প্রথমে যাহারা মূর্ত্তিপূজক ছিল এক্ষণে তাহারা একেশ্বরবাদী। আমাদের মধ্যেও অমূর্ত্ত ঈশ্বরের উপাসনা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। মুসলমানেরা আমাদিগকে 'বুৎপরস্ত'

বলিয়া ঘৃণা করে। আমরা যেন ঐ নিন্দাবাদের উর্দ্ধে উঠিতে পারি। সেই অমূর্ত্ত ঈশ্বরের উপাসনা সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্র বিরোধী নহে। শাস্ত্রে কনিষ্ঠ অধিকারী ও শ্রেষ্ঠ অধিকারির উল্লেখ আছে। জ্ঞানীরা ব্রহ্মের অধিকারী। যদি তাহাই হয় তবে আধ্যাত্মিক জগতে আমরা কি চিরকালই শিশুর মত থাকিব? শৈশবকালে পুতুল খেলা শোভা পায়, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে নহে। এত জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চা, বিবিধ-বিদ্যার আলোচনা, এখনও আপনাদিগকে কি কনিষ্ঠ অধিকারী ভাবিয়া চুপ করিয়া থাকিব? নিম্ন হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে সচেষ্ট হইব না? এমন মনে করিবেন না যে পৌত্তলিকতার সংস্রব পরিত্যাগ করিলে আমরা হীনবল নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িব। আমাদের একঘোরে হইবার ভয় নাই। একবার ভাবিয়া দেখুন আমাদের দলবল কি সামান্য? অমূর্ত্ত ঈশ্বরের উপাসক সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। সর্ব্বোপরি বেদ উপনিষদের ঋষিগণ,তাহার পরে নানক কবীর প্রভৃতি এদেশীয় একেশ্বরবাদী,আর্য্য-সমাজ, মুসলমান-সমাজ—বলিতে গেলে সমুদয় সভ্য-জগতের লোক, আজ অমূর্ত্ত ঈশ্বরের উপাসক। বৈদিক-সময়ে ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন "য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে" যিনি আত্মদাতা বলদাতা সমুদয় বিশ্ব যাঁহার উপাসনা করিতেছে আমরা সেই দেবতার উপাসক। উপনিষদের ঋষিরাও বলিয়া গিয়াছেন "ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ" তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ্যশ; অর্থাৎ তাঁহার যশোভাতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেদীপ্যমান।

এবিষয়ে মহর্ষির দৃষ্টান্তের প্রতি লক্ষ্য কর। তাঁহার আত্মজীবনীতে দেখিতে পাইবে তিনি এই অপৌত্তলিক উপাসনা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কত না আত্মত্যাগ স্বীকার করিলেন—কত নিন্দা গ্লানি অকাতরে সহ্য করিলেন—পরিবারের সহিত বিচ্ছেদবশতঃ কত জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিলেন তথাপি তিনি সত্যকে ধরিয়া রহিলেন—ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন না—তাঁহার প্রিয়তম ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিলেন না। অপৌত্তলিক অনুষ্ঠানে তাঁহার মানসিক দৃঢ়তার যে পরিচয় পাই, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। এই দৃষ্টান্তে তোমরাও বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠানে এক হইয়া দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাক। অবস্থা-বিশেষে একটুকুও পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। আমরা সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসক। "সত্যান্ন প্রমদিতব্যং"সত্য হইতে রেখামাত্র বিচ্ছিন্ন হইবেক না। হিন্দু সমাজ হইতে যদি বা বিচ্ছিন্ন হইতে হয় তথাপি ধর্ম্ম হইতে—সত্য হইতে আমরা যেন রেখা-পরিমাণ পরিচ্যুত না হই। প্রচলিত হিন্দু সমাজের দুই বাহু—পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ। পৌত্তলিকতার স্থানে এক অমূর্ত্ত ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে শত সহস্র বাধা আমাদের পথে আসিয়া পড়িবে সত্য, কিন্তু সে সকলকে অতিক্রম করাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত।" সকলে উত্থান কর, জাগ্রত হও, প্রকৃত সদ্গুরুর নিকট গিয়া শিক্ষা লাভ কর। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে কি শিক্ষা লাভ করিয়াছি? এই যে একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মই আমাদের আরাধ্য দেবতা। সৃষ্টবস্তুকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিবেক না। অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরকে প্রীতি কর,এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য জানিয়া জীবনের কর্ত্তব্যসকল সম্পন্ন কর, ইহাতেই তোমাদের ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ।

হারামণির অন্বেষণ।

উপক্রমণিকা।

প্রাণ চায় তো আর কিছু না—কেবল সে খাইয়া-পরিয়া কথঞ্চিৎপ্রকারে বর্ত্তিয়া থাকিতে পারিলেই বাঁচে। মনের আকিঞ্চন আর একটু বেশী—মন চায় আনন্দে বর্ত্তিয়া থাকিতে। জ্ঞান হাত বাড়ায় আরো উচ্চে—জ্ঞান চায় অক্ষয়ধনে ধনী হইয়া নিত্যকাল আনন্দে বর্ত্তিয়া থাকিতে, অর্থাৎ আনন্দে বর্ত্তিয়া থাকা'র ব্যাপারটাকে আপনার কর্ত্তৃত্বের মুঠার মধ্যে আনিতে। জ্ঞান যাহা চায়, তাহা সে পাইবে কেমন করিয়া। জ্ঞান যে আত্মবিস্মৃত। একএকবার বিদ্যুতের ন্যায় যখন তাহার স্মৃতি গা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে, তখন সে মাথা তুলিতেছে—তাহার পরক্ষণেই নতশির! আত্মাকে হারাইয়া জ্ঞান দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াছে বড়ই বিষম! মণিহারা ফণীর ন্যায় অধীর হইয়া উঠিতেছে যখন-তখন! হারামণি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে যেখানে-সেখানে! চেষ্টা ছাড়িতেছে না কিছুতেই! একবারকার রোগী যেমন আরবারকার রোঝা হয়, জ্ঞান তেম্নি—একবার প্রাণ হইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে, একবার মন হইয়া প্রশ্ন তুলিতেছে, একবার বুদ্ধি হইয়া উত্তরপ্রদান করিতেছে। বুদ্ধির কথা—একবার মন বুঝিতেছে, প্রাণ বুঝিতেছে না; একবার প্রাণ বুঝিতেছে, মন বুঝিতেছে না; একএকবার আবার এমনও হইতেছে যে, বুদ্ধি নিজের কথা নিজে বুঝিতেছে কি না, সন্দেহ। নানা শ্রেণীর নানা কথার ঘ্যানঘ্যানানিতে তিতিবিরক্ত হইয়া আমি জ্ঞানকে বলিলাম—"তোমার আপনার সঙ্গে আপনার এরূপ বোঝাপড়া চলিতে থাকিবে কতদিন?" ভ্রূললাট কুঞ্চিত করিয়া জ্ঞান তাহার উত্তর দিলেন এই যে, "হারামণি পাওয়া না যাইবে যতদিন।"

প্রশ্নোত্তর।

মূল জিজ্ঞাস্য দুইটি—(১) কি আছে এবং (২) কি চাই। ইহার সোজা উত্তর এই যে, আছে সত্য,—চাই মঙ্গল।

প্রশ্ন। এ যে একটি কথা তুমি বলিতেছ "আছে সত্য"—তোমার এই গোড়া'র কথাটি'র ভাবার্থ আমি এইরূপ বুঝিতেছি যে, যাহা আছে, তাহাই সত্য। তবেই হইতেছে যে, সবই সত্য—সত্য ছাড়া দ্বিতীয় পদার্থ নাই। কিন্তু মঙ্গল চাহিতে গেলে মঙ্গল বলিয়া একটা পৃথক্ বস্তু থাকা চাই, আর, তা ছাড়া—চাহিবার একজন কর্ত্তা থাকা চাই। সত্য ছাড়া দ্বিতীয় পদার্থ যখন নাই—তখন যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া তদ্ব্যতীত চাহিবার বস্তুই বা পাইতেছ কোথা হইতে—চাহিবার কর্ত্তাই বা পাইতেছ কোথা হইতে?

উত্তর। সত্য আপনিই চাহিবার বস্তু, আপনিই চাহিবার কর্ত্তা। সত্য আপনাকে আপনি চা'ন, আপনাকে আপনি পা'ন; আপনাতে আপনি আনন্দে বিহার করেন;—সত্যই মঙ্গল।

প্রশ্ন। আপনাকে-আপনি-চাওয়াই বা কিরূপ, আপনাকে-আপনি-পাওয়াই বা কিরূপ?

উত্তর। সত্য যদি কস্মিন্‌কালেও কাহারো নিকটে প্রকাশিত না হ'ন; না আপনার নিকটে—না অন্যের নিকটে—কাহারো নিকটে কোনোকালে প্রকাশিত না হ'ন, আর, কোনোকালে যে কাহারো নিকটে প্রকাশিত হইবেন—মূলেই যদি তাহার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে "সত্য আছেন"-কথাটাই মিথ্যা হইয়া যায়। সত্য যদি প্রকাশই না পা'ন, তবে তিনি যে

আছেন, তাহা কে বলিল? তাহার প্রমাণ কি? সত্য যদি তোমার নিকটে জন্মেও প্রকাশ না পাইয়া থাকেন, আর, তবুও যদি তুমি বলো "সত্য আছেন", তবে তোমার সে কথার মূল্য—এক কানাকড়িও নহে। দ্বিপ্রহর রজনীতে তুমি যখন প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলে, তখন তুমি ভাবিতেও পার নাই যে, সত্য বলিয়া এক অদ্বিতীয় ধ্রুব-পদার্থ সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে বিদ্যমান। তোমার নিদ্রাভঙ্গে যখন তোমার নবোন্মীলিত চক্ষে চেতনের কপাট এবং দিক্‌চক্রবালে আলোকের কপাট—এক কপাট মর্ত্ত্যলোকে এবং আর-এক কপাট স্বর্গলোকে—দুই লোকে দুই কপাট একই সময়ে উদ্ঘাটিত হইল, আর সেই শুভযোগে যখন তুমি উপরে-নীচে আশেপাশে এবং চারিদিকে চাহিয়া-দেখিয়া জানিতে পারিলে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কল্যও যাহা ছিল—অদ্যও তাহাই আছে, আর, সেই সঙ্গে যখন দেখিলে যে, বিশ্ব-জননী প্রকৃতির ক্রোড়ে কল্যও যেমন নিঃশঙ্কচিত্তে বসিয়া ছিলে, অদ্যও তেম্নি নিঃশঙ্কচিত্তে বসিয়া আছ, তখন তোমার মন বলিল যে, সত্য আছেন, আর, তোমার সুবুদ্ধি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সায় দিল। "কে তোমাকে জাগাইয়া তুলিল?" এখন তোমার মুখে কথা ফুটিয়াছে, তাই তুমি বলিতেছ, "আমাকে কেহই জাগাইয়া তোলে নাই—আমি আপ্নি জাগিয়া উঠিয়াছি।" এটা তুমি দেখিতেছ না যে, তুমি যাহাকে বলিতেছ "আমি আপ্নি"—তোমার গতরাত্রের প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় সে আপ্নি ছিলই না মূলে, তাহার পরিবর্ত্তে ছিল কেবল একটা অন্ধ, পঙ্গু এবং অকর্ম্মণ্যের একশেষ তোমার বিছানায় পড়িয়া। সেই অসাড় অপদার্থটা'র কর্ম্ম কি আপনার বলে অজ্ঞান-অন্ধকার ঠেলিয়া-ফেলিয়া জ্ঞানে ভর করিয়া দাঁড়ানো? যাহার হাত-পা অসাড়, চক্ষু অন্ধ, তাহার কি কর্ম্ম সাঁতার দিয়া পদ্মা পার হইয়া উচ্চডাঙায় উঠিয়া দাঁড়ানো? সে তো তখন অকর্ত্তা। অকর্ত্তা'র আবার কর্ম্ম কিরূপ? অকর্ত্তার কর্ম্মও যেমন, আর, বন্ধ্যার পুত্রও তেম্নি, দুইই সমান। ফল কথা এই যে, তোমার প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় একে তো জাগিয়া উঠিতে পারিবার মতো শক্তি ছিল না তোমার হাড়ে একবিন্দুও; তাহাতে আবার, জাগিয়া উঠিবার ইচ্ছা যে, কোনো দিক্ দিয়া তোমার মনের ত্রিসীমার মধ্যেও প্রবেশ করিবে, তাহার পথ ছিল না মূলেই। অতএব এটা স্থির যে, তুমি আপন ইচ্ছায় জাগিয়া ওঠো নাই। কাহার ইচ্ছায় তবে তোমার মনের অজ্ঞান-অন্ধকার ঠেলিয়া-ফেলিয়া প্রাণের ভিতর হইতে জ্ঞানের আলোক অল্পে-অল্পে ফুটিয়া বাহির হইল? সত্য ভিন্ন যখন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, তখন কাজেই বলিতে হইতেছে যে, জাগ্রৎ-জগতেই হো'ক্ আর নিদ্রিত জগতেই হো'ক্, পর্ব্বতশিখরেই হো'ক্ আর সমুদ্র-গর্ভেই হো'ক্, পর্ণকুটীরেই হো'ক্ আর স্বর্ণপ্রাসাদেই হো'ক্—যেখানে যে-কোনো কার্য্য হইতেছে, হইতেছে তাহা সত্যেরই ইচ্ছায়—তোমার ইচ্ছায়'ও নহে, আমার ইচ্ছায়'ও নহে। সত্যই আপন ইচ্ছায় তোমাকে জাগাইয়া-তুলিয়া তোমার নিকটে প্রকাশিত হইলেন; তা' শুধু না—তিনিই আপন ইচ্ছায় তোমাকে জাগাইয়া রাখিয়া তোমার নিকটে প্রকাশ পাইতেছেন, আর, প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়াই, তুমি অকুতোভয়ে বলিতে পারিতেছ যে, সত্য আছেন। সত্য এই যে তোমার নিকটে প্রকাশিত হইতেছেন, আর, তুমি যে সত্যের প্রকাশ নয়ন ভরিয়া পান করিয়া প্রত্যহ

পুনর্জন্ম লাভ করিতেছ, ইহার অবশ্যই কোনো-না কোনো নিগূঢ় কারণ অছে—নহিলে সত্যই বা তোমার কে, আর, তুমিই বা সত্যের কে যে, তুমি সত্যের দেখা না পাইলে তোমার মঙ্গল নাই, আর, সত্য তোমাকে দেখা না দিলে তাঁহার নিস্তার নাই। কেমন করিয়া বলিব যে, তুমি সত্যের কেহই না বা সত্য তোমার কেহই না। তুমি তো আর অসত্য নহ। তুমি যে আমার চক্ষের সম্মুখে সত্য দেদীপ্যমান! তুমি যদি অসত্য হইতে, তবে তোমাকে কে বা পুঁছিত? তুমি সত্য বলিয়াই সত্য তোমার নিকটে প্রকাশিত হইতেছেন; সত্য সত্যেরই নিকটে প্রকাশিত হইতেছেন—পরের নিকটে না। অতএব এটা স্থির যে, তোমার নিকটেই হো'ক্, আমার নিকটেই হো'ক্, আর তৃতীয় যে-কোনো ব্যক্তির নিকটেই হো'ক্, যাহারই নিকটে সত্য প্রকাশ পা'ন—প্রকাশ পা'ন তিনি সত্যেরই নিকটে—আপনারই নিকটে। সত্যের এই যে আপনার নিকটে আপনার প্রকাশ, ইহারই নাম আপনাকে আপনি পাওয়া। কেন না, সত্যের প্রকাশেরই নাম সত্যের উপলব্ধি, আর, তাহারই নাম সত্যকে পাওয়া। আপনাকে আপনি-পাওয়া কিরূপ, তাহা দেখিলাম, এখন আপনাকে-আপনি-চাওয়া কিরূপ, তাহা দেখা যা'ক্। আপনার প্রকাশে যখন আপনার প্রতি আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, তখন আপনার প্রতি আপনার দৃষ্টির সেই যে প্রসক্তি, তাহা শুধুই কি কেবল চক্ষের চাওয়া? উদাসীন পরিব্রাজক পার্শ্বস্থ পুরস্বামীর প্রতি যে-ভাবে মুহূর্তেক চাহিয়া আপনার গন্তব্যপথ অনুসরণ করেন, উহা কি সেইভাবের চাওয়া? সত্য কি আপনার নিকটে আপনি কোথাকার কোন একজন বেয়ানা লোক? তাহা হইতেই পারে না। ঠিক্ তাহার বিপরীত। পরস্পরের পছন্দসই সুবিবাহিত বরকন্যার শুভদৃষ্টির বিনিময়কালে উভয়ের চক্ষের চাওয়া'র মধ্য দিয়া কেমন অকৃত্রিম প্রাণের চাওয়া বাহির হইয়া পড়িতে থাকে—তাহা তো তোমার দেখিতে বাকি নাই! সেই-ভাবের প্রাণের চাওয়া'র সঙ্গে আপনাকে-আপনি চাওয়া'র সৌসাদৃশ্য থাকিবারই কথা, কেন না, সুবিবাহিত বরকন্যা দোঁহে দোঁহার দ্বিতীয় আপ্নি। এটাও কিন্তু দেখা উচিত যে, দুয়ের মধ্যে সৌসাদৃশ্য যতই থাকুক্ না কেন, তাহা সৌসাদৃশ্য বই-আর-কিছুই নহে; সে সৌসাদৃশ্য একপ্রকার অপ্রতিমের প্রতিমা বা জ্যোতির্মণ্ডলের গাত্রচ্ছায়া। প্রকৃত কথা এই যে, সত্য যে কিরূপ শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-পবিত্র-মধুময়-ভাবে আপনার প্রতি আপনি চা'ন, আর, সেই অনিরুদ্ধ জ্ঞানের চাওয়ার মধ্য দিয়া অতলস্পর্শ গভীর প্রাণের চাওয়া যে কিরূপ অপরিসীম ধীর গম্ভীর এবং অটল শক্তিপ্রভাবে—মহাসংযম এবং মহা-উদ্যম দুয়ের অনির্ব্বচনীয় যোগ-প্রভাবে উদ্বেল হইয়া, জ্যোতির্ম্ময় আশীর্ব্বাদে নিখিল ব্যোম উদ্দীপিত করিয়া, ভূর্ভুবস্বঃ হইয়া দশদিকে ফাটিয়া পড়িতেছে, তাহা (আমরা তো কাটাণুকীট) মহোচ্চ দিব্যধামবাসী মুনি-ঋষি এবং দেবতাদিগেরও ধ্যানের অতীত।

প্রশ্ন। তা তো বুঝিলাম। কিন্তু তাহাতে আমার জিজ্ঞাসা থামিতেছে না—বরং বৃদ্ধিই পাইতেছে। আমি চাই জানিতে চাওয়া এবং পাওয়া একত্র বাস করিবে কেমন করিয়া? বাঘে গোরুতে একঘাটে জল পি'বে কেমন করিয়া? আমি তো এইরূপ বুঝি যে, যতক্ষণ পাওয়া না হয়, ততক্ষণই প্রাণের ভিতর হইতে চাওয়া

বাহির হইতে থাকে; পাওয়া হইলেই চাওয়া ঘুচিয়া যায়। তবে যদি বলো যে' সত্য কোনো-সময়ে বা আপনাকে পা'ন, কোনো-সময়ে বা আপনাকে চা'ন; সেটা বটে একটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। তাই কি তোমার অভিপ্রায়? তুমি কি বলিতে চাও, সত্যের প্রকাশ সাময়িক প্রকাশ? আবার তা'ও বলি, অপ্রকাশের অবস্থায় চাওয়া কতদুর সম্ভবে—সেটাও একটা ভাবিবার বিষয়—বিশেষত প্রতিদিনই যখন দেখিতেছি যে, রাত্রিকালের প্রগাঢ় নিদ্রা-বস্থায় অপ্রকাশ যে-সময়ে সর্ব্বেসর্ব্বা হয়, সে সময়ে চাওয়া ধুইয়া পুঁছিয়া মন হইতে এম্নি সাফ্ সরিয়া পালায় যে, তাহার চিহ্ন-মাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। বলিতে কি—আমার জিজ্ঞাসা রক্তবীজের সহোদর—মরিতে চাহে না কিছুতেই! এক বীরের নিপাত হইল তো অম্নি তার জায়গায় তিন বীর আসিয়া তাল ঠুকিয়া দণ্ডায়মান! তার সাক্ষী:—

নবোত্থিত তিন প্রশ্ন।

(১) চাওয়া-পাওয়া'র একত্র-বাস কিরূপে সম্ভবে?

(২) সত্যের প্রকাশ সাময়িক প্রকাশ না চিরপ্রকাশ?

(৩) প্রকাশ এবং অপ্রকাশের সহিত চাওয়া-পাওয়া'র কিরূপ সম্বন্ধ?

উত্তর। তোমার তিন প্রশ্নের উত্তর আমি যথাক্রমে দিব—মাসখানেক ধৈর্য্য ধরিয়া থাকো।

নানা কথা।

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।—বিগত ২৩এ আষাঢ় সোমবার সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কলিকাতা আলবার্ট হলে এক সভার অধিবেশন হয়। মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বৃষ্টির আধিক্য হইলেও উপস্থিতের সংখ্যা মন্দ হয় নাই। হিন্দু ব্রাহ্ম খৃষ্টান বৌদ্ধ আর্য্যসমাজী অনেকগুলি খ্যাতনামা ব্যক্তি সভায় আসিয়াছিলেন। সঙ্গীত হইয়া কার্য্য আরম্ভ হইলে বর্দ্ধমানাধিপ যাহা বলেন তাহার সারাংশ এই "ক্ষুদ্রাকারে যদিও ব্রহ্ম-বিদ্যালয় কলিকাতায় স্থাপিত হইতে চলিল, আশা করি ভবিষ্যতে ইহা সমগ্র ভারতের হইয়া দাঁড়াইবে। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য অনুষ্ঠান-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে; বিনয়েন্দ্র বাবু এখনই তাহার সবিশেষ পরিচয় দিবেন। যে অসাম্প্রদায়িক ও সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপরে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহার অনুকূলে আমি কয়েকটি মাত্র কথা বলিব। আমরা চাই যে প্রকৃত একেশ্বরবাদিগণ এখানে মিলিত হইয়া নিজ নিজ মতের আলোচনা করিবেন—সাহায্য করিবেন যাহাতে উৎসাহী যুবকগণ এখান হইতে সুশিক্ষিত হইয়া ভারতের সকল শ্রেণীর ভিতরে একেশ্বরবাদ শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে উপাসনারত করিয়া তুলিতে পারে, তাহাদের আধ্যাত্মিক ঔদাসীন্য দূর করিয়া দেয়। আমি যে কেবলমাত্র একজন ভারতবাসী তাহা নহে, আমি আর্য্য সন্তান। আমি বিষন্ন হইয়া চিন্তা করি হায়! ভারতবাসীকে কি আবার একেশ্বরবাদ স্মরণ করিয়া দিতে হইবে। ইহা কি সেই আর্য্যাবর্ত্ত নহে যেখানে একেশ্বরবাদ বিদ্যমান ছিল, এখনও আছে, কিন্তু হায়! এমনই বিকলাঙ্গ যে চিনিবার জো নাই, উহা বহু-ঈশ্বরবাদে—পৌত্তলিক উপাসনায় পরিণত, তাই হিন্দু সমাজের এই ভীষণ দুর্গতি—কেবলই জীবনশূন্য আড়ম্বর ও পদ্ধতির ভিতরে ধর্ম্ম আবদ্ধ; তাই ভারত ও ভারতবাসীর এই ভয়ানক অবনতি। স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ! বর্ত্তমানে তোমরা নানাবিধ ক্ষমতা লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু তৎসমস্ত প্রকৃত কল্যাণকর কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। ঈশ্বরের নাম-প্রচার কি সত্য সত্যই অসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে! ঈশ্বরকে তোমরা অবহেলা করিতেছ, কেবল কি ভয় বিপদের সময় তাঁহার আশ্রয় পাইতে চাও। মৃণ্ময় দেব-মূর্ত্তি হইতে তোমার কোন প্রত্যাশা নাই। মানব-রূপী দেবদেবী হইতে যখনই তোমার বিশ্বাস বিচলিত হইবে, তখনই তোমার আত্মা প্রকম্পিত হইবে, অনুতাপ জাগিয়া উঠিবে, ব্যাকুলতার সহিত বলিবে, হে ঈশ্বর! আমাকে দয়া কর। প্রার্থনা চাই, প্রার্থনার মত আর বল নাই; কিন্তু সেই প্রার্থনা সেই সত্য-স্বরূপ কৃপাময় মহাবলী ঈশ্বরের দিকে উঠা চাই। কিন্তু কেন আমরা তাঁর প্রতি বিমুখ, কেন তাঁর প্রতি আমাদের এত বিরাগ—সেই দেশে যেখানকার অধিবাসী তাঁহার গুহ্য-বাণী সর্ব্ব প্রথমে শ্রবণ করিয়াছিল। কিন্তু হায়! ক্রিয়া-কাণ্ড লইয়া আমরা ব্যতিব্যস্ত ও বিভ্রান্ত—

ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ জোর করিয়া সে শিক্ষা আমাদিগকে দিয়াছেন—এখনও তাহাতে আমাদের বিশ্বাস আকর্ষণ করিবার জন্য বড় অধীর। তুমি পূজা করিতেছ, গৃহ দেবতার আরাধনা করিতেছ, রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া ইংরাজি বাজনা বাজাইয়া উপনয়ন ও বিবাহ দিতেছ, শ্রাদ্ধ উপলক্ষে স্বর্ণ রৌপ্যের তৈজস বিতরণ করিতেছ; কিন্তু ভিতরে নাস্তিক তুমি; গোপনে পরদারসেবা ও জঘন্য পাপ কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত নহ; তথাপি তুমি তোমার সমাজে শ্রেষ্ঠ-হিন্দু বলিয়া পরিগণিত। এই কি প্রেমের ধর্ম্ম, ঈশ্বরের ধর্ম্ম, যাহার জন্য মুক্তি পাইতে চাও। আমি একজন সংস্কারক নহি, নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া ভাণ করি না; কিন্তু এই মাত্র বলিতে চাই, বৈদেশিক আকারে রাজনৈতিক ও দেশহিতকর অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত রহিয়াছ—কিন্তু যাহা মনুষ্য মাত্রেরই প্রকৃত অভাব, তাহার প্রতি তুমি অন্ধ। সকল বর্ণকে মিলিত করিয়া এক জাতি নির্ম্মাণের একমাত্র উপায় আছে, তাহা সত্য ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। সর্ব্ববিধ মীমাংসা উহা হইতেই সম্ভব। নিজ হস্তে সমাজকে সংস্কৃত কর, ইহার সর্ব্ববিধ কালিমা মুছাইয়া দাও। নিজে জাগ্রত হও, ভারতে একেশ্বরবাদপ্রচারের আবশ্যকতা উপলব্ধি কর, অসাম্প্রদায়িক ও উদারভাবে ইহার প্রচারে প্রবৃত্ত হও। যদি জিজ্ঞাসা কর, একেশ্বরবাদ হইতে কি মিলিবে, উত্তরে বলিব পরস্পরের প্রতি স্নেহপ্রীতি, দীনে দয়া, আত্ম-বিসর্জ্জন, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়—খৃষ্টধর্ম্মকে যাহা গরীয়ান করিয়াছে, পাদ্রীগণের (dogma) অন্ধমত শিক্ষা দানের কথা বলিতেছি না। ভারতের দূরবর্ত্তী গ্রামে প্রবেশ কর দেখিবে বৃদ্ধ মৃত্যু শয্যায় শায়িত, বিসূচিকা বা প্লেগ তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে; ঘোর যন্ত্রনায় সে অধীর—সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে। এই রাজধানীর ভিতরেই দেখিবে, জীর্ণ-দুর্ব্বল ক্ষুদ্র-অশ্ব সবেগে গাড়ি টানিয়া চলিতেছে; সারথী আরও গতিবেগবৃদ্ধি জন্য অশ্বের ক্ষতপৃষ্ঠের উপর নৃশংস কশাঘাত করিতেছে; লোকে দেখিয়াও দেখে না। সেই পরমপিতাকে আরাধনা কর, মনুষ্য ও জীবে প্রীতি অবতীর্ণ হইবে, নিষ্ঠুরতা চলিয়া যাইবে, কেন না ঈশ্বর যিনি, তিনি প্রেম দয়া ও শান্তির প্রস্রবণ।"

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাতে বক্তার করুণ ও বিশাল হৃদয়ের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিদেশ ভ্রমণে রাজার মহদুপকার সাধিত হইয়াছে। অন্য দেশের আচার ব্যবহার নিজ চক্ষে সন্দর্শন করিয়া না আসিলে সকল সময়ে আপনাদের ত্রুটি অনুভব করা যায় না, বা তাহা দূর করিবার জন্য ঐকান্তিকতা আইসে না। আমরা বর্দ্ধমানপতির নিকট অনেক বিষয় প্রত্যাশা করি। বিদ্যা ও ধন-ঐশ্বর্য্যে যাঁহারা প্রভুত্ববান, তাঁহাদের সামান্য ইঙ্গিতে যে মহৎ কার্য্য অচিরে সুসাধ্য ও সুসম্পন্ন হয়, দরিদ্রের শত চীৎকারে সে ফল ফলে না।

বর্ত্তমান বর্দ্ধমানপতির পিতামহ স্বর্গীয় মহাতাপ চাঁদ বিলক্ষণ সুশিক্ষিত ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। তাঁহার প্রাসাদে তাঁহারই ব্যবস্থায় ব্যাপককাল ধরিয়া আদি-ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত স্বর্গীয় দয়ালচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় সাপ্তাহিক উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। উপাসনা কয়েক বৎসর হইল শিরোমণি মহাশয়ের দেহান্ত হওয়ায় বন্ধ রহিয়াছে। বেদ-শিক্ষার জন্য যে চারি জনকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কাশীধামে প্রেরণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম সুপণ্ডিত স্বর্গীয় শ[illegible] ও তারক-নাথ তত্ত্বরত্নকে পরলোক-গত রাজা মহাতাপচাঁদ মহর্ষির নিকট হইতে লইয়া নিজ রাজ-সংসারে নিয়োগ করেন এবং বিবিধ সদনুষ্ঠানের মধ্যে মহামূল্য মহাভারত অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন এবং তাঁহা[illegible]র ও তত্ত্বরত্নের ভ্রাতা অঘোরনাথের এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের সাহায্যে অনুবাদ কার্য্য প্রধানতঃ সুসম্পন্ন করিয়া লন। বর্ত্তমান মহারাজ হইতেও তাঁহার পবিত্র বংশ আরও ভাস্বর হইবে, আপনাদের পূর্ণভরসা।

আগামী বারের পত্রিকায় ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের সংকল্প সম্বন্ধে পরিচয় দিবার ইচ্ছা রহিল।

আজান।—মুসলমানদিগের মসজেদ হইতে প্রার্থনার পূর্ব্বে মৌলবীগণ উপাসকবর্গকে সমবেত হইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে যে আহ্বান করেন, তাহাকে আজান কহে। কর্ম্মনিরত সংসারনিমগ্ন জনসাধারণকে উপাসনার্থ আহ্বান বড়ই সুমিষ্ট। উহার অনুবাদ এই, "ঈশ্বর মহান্! ঈশ্বর মহান্! ঈশ্বর মহান্! ঈশ্বর ভিন্ন আর অন্য ঈশ্বর নাই, আমি তার সাক্ষী। মহম্মদ ঈশ্বরের দূত, আমি তার সাক্ষী। প্রার্থনার জন্য আইস। প্রার্থনার জন্য আইস। মুক্তির জন্য আইস। ঈশ্বর মহান্। ঈশ্বর ভিন্ন আর অন্য ঈশ্বর নাই। (প্রাভাতিক আজানে আরও বলিতে হয়) "নিদ্রা অপেক্ষা প্রার্থনা শ্রেষ্ঠতর।"

নমাজ।—মুসলমানগণের প্রার্থনার অনুবাদ এই "এই প্রভাতে সরল অন্তরে ঈশ্বরের নিকট নিবেদন করি; ঈশ্বর মহান্! হে ঈশ্বর পবিত্র তুমি, তোমাতেই প্রশংসা; মহান্ তোমার নাম ও গৌরব; তোমা ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই। সদয় ও কৃপাময় ঈশ্বরের নামে অভি-শপ্ত সয়তানের নিকট হইতে (তোমাতে) রক্ষা পাইতে চাই। ঈশ্বরের নাম ধন্য হউক; তিনি সমুদয় পৃথিবীর অধিপতি,দয়াময় ও কৃপালু,বিচার-দিনের রাজা। আমরা

তোমাকেই পুজা করি, তোমারই নিকট সাহায্য ভিক্ষা করি। সরল-পথে আমাদিগকে পরিচালিত কর—তাহাদের সেই পথে—যাহাদের প্রতি তুমি কৃপা করিয়াছ—যাহাদের উপর ক্রোধ কর নাই—যাহারা বিপথে গমন করে না"। আমেন।

দান (জাকাত)।—কোরাণের আদেশ "মুসলমান মাত্রকেই দান করিতে হইবে। অর্থ, পশু, ফল, শস্য, পণ্যদ্রব্য এ সমস্তই দানের সামগ্রী। যিনি চল্লিশ টাকার অধিকারী, তাঁহাকে অন্ততঃ এক টাকা দান করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রতিশতে দানের অঙ্ক আড়াই টাকা। সকল পশু সম্বন্ধে দানের অঙ্ক সমান নহে। ফল-শস্য সম্বন্ধে দানের অঙ্ক অধিক। দরিদ্র মক্কাযাত্রী সন্ন্যাসী, ঋণ-শোধে অক্ষম লোক, ভিক্ষাজীবী, নিঃস্ব পথিক, মুসলমানধর্ম্মে নবদীক্ষিতগণই কোরাণের মতে যথার্থ দানের পাত্র। কোরাণের দানের বিধি-ব্যবস্থা অন্যত্র বড়ই দুর্লভ।

কর্ত্তব্য-পঞ্চক।—মুসলমানদিগকে পাঁচটি বিষয় প্রতিপালন করিতে হয়। (১) বলিতে হইবে ঈশ্বর এক এবং মহম্মদ তাঁহার প্রবক্তা (২) প্রতিদিন পাঁচ বার নমাজ অর্থাৎ প্রার্থনা করিতে হইবে, (৩) রমজান মাসে ৩০ দিন উপবাস করিতে হইবে, (৪) দান করিতে হইবে, (৫) জীবনে অন্ততঃ একবার মক্কা যাইতে হইবে।

ঈশ্বরের স্বরূপ। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে মুসলমানগণের যেরূপ উচ্চ ধারণা, তাহা অন্য ধর্ম্মে বিরল। ইমাম গাজালি বলেন "ঈশ্বর এক, কেহ তাঁর (অংশী) সঙ্গী নাই, বিচিত্র তাঁহার সত্তা, কেহ তাঁহার সমান নাই। তিনি অপরিবর্ত্তনীয়, স্বতন্ত্র, পুরাতন, কেহ তাঁহার আদি নাই। তিনি অনন্ত, সনাতন, আদি-অন্ত-বিহীন। তিনি চিরকালই থাকিবেন, তাঁহার শেষ নাই। তিনি আছেন, ছিলেন, থাকিবেন। সকল মহিমা তাঁহাতে। দেশ কালে তিনি অপরিচ্ছেদ্য। আদি ও অন্তে তিনি। তাঁহার শরীর নাই। তিনি অসীম অপরিমেয়। দেহের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য নাই, কেন না দেহের পরিমাণ আছে এবং দেহকে খণ্ড-বিখণ্ড করা যায়। তিনি বস্তু নহেন এবং বস্তুও তাঁহাতে নাই। তিনি হটাৎ উৎপন্ন হন নাই—আকস্মিকতা তাঁহাতে নাই। তিনি অপরিমেয়, সীমার মধ্যে তিনি নাই, কেহ তাঁহাকে ঘেরিয়া নাই। স্বর্গে তিনি অবস্থিত নহেন। তিনি তাঁহার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সেই সিংহাসনে—যাহার ব্যাখ্যা তিনি নিজেই দিয়াছেন।

মুসলমান-সমাধি (জানাজা)।—শবাধার বহন করিয়া লইয়া যাওয়া মুসলমানদিগের মধ্যে বিশেষ পুণ্যপ্রদ। শবের পশ্চাতে নগ্নপদে যাইতে হয়। সমাধি স্থলে প্রার্থনা পঠিত হয় না। মসজেদে, মৃতের বাটীর বা সমাধি-স্থলের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত স্থানে প্রার্থনা হয়। ইমাম বা কাজি এই ভাবে প্রার্থনা করেন "আমি মৃতের সম্বন্ধে প্রার্থনা করি, আমি এই মৃতের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, হে ঈশ্বর পবিত্রতা তোমাতে—তোমাকে প্রশংসা করি। মহান্ তোমার নাম। অসীম তোমার মহত্ব ও খ্যাতি। তোমা ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর মহান্! হে ঈশ্বর! মহম্মদের উপর কৃপা কর, তাঁহার বংশাবলীর উপর কৃপা কর; যেরূপ এব্রাহাম ও তাহার বংশীয়গণের উপর তুমি দয়া শান্তি আশীর্ব্বাদ ও কৃপা বর্ষণ করিয়াছিলে। তোমাতে প্রশংসা, মহান্ তুমি। যাহারা জীবিত ও মৃত, যাহারা এখানে উপস্থিত বা অনুপস্থিত, আমাদের সন্তান সন্ততি—যাহারা পূর্ণবয়স্ক-পুরুষ বা স্ত্রী, সকলকে ক্ষমা কর। আমাদের মধ্যে যাহাদিগকে জীবিত রাখিয়াছ, তাহাদিগকে ধর্ম্মেতে জীবিত রাখ; যাহারা মরণোন্মুখ—বিশ্বাসে তাহাদিগকে মরিতে দাও। ঈশ্বর মহান, শান্তি ও দয়া তোমাতে। শান্তি ও দয়া তোমাতে।" পরে সমাগত লোকেরা বসিয়া নিস্তব্ধ ভাবে মৃতের আত্মার জন্য প্রার্থনা করে। শেষ হইলে তাহারা বলে "ঈশ্বরের ইহাই ইচ্ছা", উত্তরে মৃতের ঘনিষ্টতম আত্মীয় বলেন "ঈশ্বরের ইচ্ছাতে আমি সন্তুষ্ট", আপনারা যাইতে পারেন। যাহাদের ইচ্ছা চলিয়া গেলে অবশিষ্ট লোকেরা শবের মুখ মক্কারদিকে ফির'ইয়া উত্তর দিকে মস্তক দক্ষিণে পদদ্বয় রাখিয়া মৃত্তিকাগর্ত্তে উহাকে স্থাপন করিবার সময় বলে "আমরা ঈশ্বরের নামে এবং মহম্মদের ধর্ম্মের বিধানে মৃতকে ধরাগাত্রে সমর্পণ করিলাম।" এই বলিয়া সমাধিগহ্বর পূর্ণ করিয়া দেয়। পরে সমাগত দরিদ্র ও ফকিরদের মধ্যে দান করিতে হয়। সমাধির তৃতীয় দিবসে মৃতের আত্মীয়-স্বজন কবর দেখিতে আসিয়া কোরাণের অংশবিশেষ পাঠ করে। যাহারা অবস্থাপন্ন, মৌলবী নিয়োগ করিয়া সমাধির নিকট সমগ্র কোরাণ পাঠ করায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের পবিত্র আদর্শ দেশ মধ্যে প্রচারের একমাত্র উপায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ইহার গ্রাহক রূপে এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী ও সাহায্যকারীরূপে আপনি আমাদের মান্য। আপনারা যদি আমাদের প্রতি উদাসীন থাকেন তবে আমাদের সকল বল, সকল আশা ও উদ্যম বিলীন হইয়া যায়; ধর্ম্ম ও পুণ্যপ্রবাহ বিশুষ্ক হয়। অতএব আপনার প্রতি সানুনয় নিবেদন এই যে, আপনার নিকট বর্ত্তমান শক পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল হিসাবে যে টাকা প্রাপ্য আছে, আপনি দয়া করিয়া অগৌণে ঐ টাকা পাঠাইয়া দেন ইহাই অনুরোধ। এই পূজার সময়ে এখানকার কর্ম্মচারী ও পাওনাদারদিগকে সকল পাওনা ও অগ্রিম দেয় চুকাইয়া দিতে হইবে। অতএব আমাদের এই প্রার্থনার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া ধর্ম্ম ও উদারতা রক্ষা করুন। ইতি ১৮২৯ শক ১৬ ভাদ্র।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তদশ কল্প
প্রথম ভাগ।
ভাদ্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৭৮।

৭৬৯ সংখ্যা

১৮২৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

হারামণির অন্বেষণ।

২

প্রশ্ন। বলিতেছিলাম যে, "যতক্ষণ পাওয়া না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্তই চাওয়া বাহির হইতে থাকে—পাওয়া হইয়া চুকিলেই চাওয়া বন্ধ হয়। তাই বলি যে, চাওয়া এবং পাওয়া একত্রে বাস করিবে কেমন করিয়া—বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল পি'বে কেমন করিয়া?

উত্তর। এইমাত্র তুমি তোমার বাগানের মালীকে ডাকিয়া আম্র চাহিলে। তুমি যদি ইহার পূর্ব্বে কোনোকালে আম্রের আস্বাদ না পাইতে, তাহা হইলে কখনই তুমি আম্র চাহিতে না। তবেই হইতেছে যে, চাওয়া বলিয়া যে একটি ব্যাপার, তাহা পাওয়া'রই রেস্ অর্থাৎ অনুতান বা লেজুড়। আবার, একটু পূর্ব্বে তুমি যখন তোমার বাগানের মালঞ্চ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলে, আর, সেই সুযোগে আমি যখন দিব্য একটি ফুটন্ত গোলাপ-ফুল দেখিয়া তাহা তুলিবার জন্য হাত বাড়াইলাম, তুমি তৎক্ষণাৎ আমার হাত টানিয়া ধরিয়া বলিলে, "কর কি—কর কি! উহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমার মন বলিতেছে 'চিরজীবী হইয়া বাঁচিয়া থাকো!' আর, তুমি কিনা স্বচ্ছন্দে উহাকে বধ করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিতেছ—তুমি দেখিতেছি জল্লাদের শিরোমণি!" ফুলের সৌন্দর্য্য সেই যে তুমি জ্ঞানে উপলব্ধি করিলে, জ্ঞানের সেই উপলব্ধি-ক্রিয়ার নামই পাওয়া, আর, আমি ফুলের গাত্রে হস্তক্ষেপ করিবামাত্র তোমার প্রাণ সেই যে কাঁদিয়া উঠিল, প্রাণের সেই ক্রন্দনের নামই ফুলটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাওয়া। যে সময়ে তুমি ফুলটিকে তোমার চক্ষের সম্মুখে পাইয়াছিলে, সেই সময় হইতেই তুমি চাহিতেছিলে যে, ফুলটি চিরজীবী হইয়া বাঁচিয়া থাকুক্; একই অভিন্ন সময়ে, তোমার জ্ঞানের পাওয়া এবং প্রাণের চাওয়া পরস্পরের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া হরিহরাত্মা হইয়া গিয়াছিল;—তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে ব্যাঘ্রমৃগের সম্বন্ধ। তোমার দৃষ্টিতে তুমি যেখানে দেখিতেছ ব্যাঘ্রমৃগের সম্বন্ধ, আমার দৃষ্টিতে আমি সেখানে দেখি-

তেছি পুরুষপ্রকৃতির সম্বন্ধ বা জ্ঞানপ্রাণের সম্বন্ধ। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—জ্ঞান সব-চেয়ে ভালবাসে কাহাকে? জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিলে জ্ঞান কি বলে? জ্ঞান বলে—প্রাণতুল্য ভালবাসাই ভালবাসার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। তাহা যখন সে বলে, তখন তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জ্ঞান প্রাণকে যেমন ভালবাসে, এমন আর কাহাকেও নহে। প্রাণ আবার তেমি ভালবাসে জ্ঞানকে। জ্ঞান একমুহূর্ত্ত চক্ষের আড়াল হইলে প্রাণ দশদিক্ অন্ধকার দেখে। জ্ঞান ছাড়িয়া পলাইলে প্রাণের নাড়ি ছাড়িয়া যায়। ভালবাসা যদিচ বস্তু একই তথাপি জ্ঞানের এবং প্রাণের ভালবাসার মধ্যে একপ্রকার অভেদ-দ্যাঁসা প্রভেদ আছে, আর, সে যে প্রভেদ, তাহার গোড়া'র কথা হ'চ্চে প্রতিযোগিতা অর্থাৎ পাশ্চাত্যবিজ্ঞানশাস্ত্রে যাহাকে বলে Polarity কিনা মিথুনীভাব। পুরুষ যে ভাবে স্ত্রীকে ভালবাসে, জ্ঞান সেইভাবে প্রাণকে ভালবাসে, আবার, স্ত্রী যেভাবে পুরুষকে ভালবাসে,প্রাণ সেইভাবে জ্ঞানকে ভালবাসে। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, নবোদিত সূর্য্য যেভাবে পদ্মিনীর প্রতি চক্ষু উন্মীলন করে, নবোদিত জ্ঞান সেইভাবে প্রাণের প্রতি চক্ষু উন্মীলন করে; তার সাক্ষী—মনুষ্যাবতারের আদিমবয়সে পৃথিবীতে জ্ঞানের যখন সবেমাত্র অরুণোদয় দেখা দিয়াছিল, তখন জ্ঞানের কার্য্যই ছিল—প্রাণ কিসে ভাল থাকে, অহোরাত্র কেবল তাহারই পন্থায় ঘুরিয়া বেড়ানো। আবার, সুরভি নিশ্বাস ছাড়িয়া পদ্মিনী যেভাবে নব বিভাকরের প্রতি হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করে, প্রাণ সেইভাবে জ্ঞানের প্রতি হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করে;—জ্ঞানকে পাইলেই প্রাণ তাহার নিকটে আপনার নিগূঢ় অন্তরের কথা খোলে—বিনা বাক্যে অবশ্য, কেন না, জ্ঞান শ্রোতা নহে—জ্ঞান দ্রষ্টা; জিজ্ঞাসা বটে শ্রোতা, আর, সেইজন্য তাহার সাঙ্কেতিকচিহ্ন কর্ণাকৃতি (?) এইরূপ;—ফলে, জ্ঞানের চক্ষে আকার-ইঙ্গিতই বাক্যের চূড়ান্ত।* একই আম্রের অঙ্কুর যেমন আঁটির দলযুগলের জোড়ের মাঝখান হইতে দুই দিকের দুই ডাল হইয়া ছট্‌কিয়া বাহির হয়, একই ভালবাসা তেমনি পুরুষপ্রকৃতির দাম্পত্যবন্ধনের মাঝখান হইতে দুইভাবের দুইতরো ভালবাসা হইয়া ছট্‌কিয়া বাহির হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, স্ত্রীর প্রতি পুরুষের ভালবাসাই বা কি-ভাবের ভালবাসা, আর, পুরুষের প্রতি স্ত্রীর ভালবাসাই বা কি-ভাবের ভালবাসা? যখন দেখিতেছি যে, স্বামী নববিবাহিতা স্ত্রীকে "তুমি আমার ভব-জলধি-রত্ন" বলিয়া অধিকার করে, তখন তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, স্বামীর ভালবাসা অধিকার-প্রধান—স্বামিত্ব প্রধান—পাওয়া-প্রধান; পক্ষান্তরে, যখন দেখিতেছি যে, স্ত্রী অকথিত ভাষায় "আমি তোমারই" বলিয়া একান্ত অধীনা-ভাবে স্বামীর আশ্রয় যাচ্ঞা করে, তখন তাহাতেই বুঝতে পারা যাইতেছে যে, স্ত্রীর ভালবাসা অধীনতা-প্রধান—চাওয়া-প্রধান, আর, চাওয়া মুখ খুলিতে পারে না বলিয়া লজ্জা-প্রধান। এখন দেখিতে হইবে এই যে, পাওয়া বা অধিক্রিয়া বা উপলব্ধিক্রিয়া জ্ঞানের যেমন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, চাওয়া বা অভাব-জ্ঞাপন বা ক্রন্দন প্রাণের তেম্‌নি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। পুরুষের প্রতি স্ত্রীর যেরূপ চাওয়া-প্রধান ভালবাসা, তাহা প্রাণদ্যাঁসা-

---

* স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু।
কালিদাস—মেঘদূত।

মনের ভালবাসা—সংক্ষেপে প্রাণের ভালবাসা; আর, স্ত্রীর প্রতি পুরুষের যেরূপ পাওয়া-প্রধান ভালবাসা, তাহা জ্ঞানঘ্যাঁসা-মনের ভালবাসা—সংক্ষেপে জ্ঞানের ভালবাসা। স্ত্রীর প্রাণের ভালবাসা এক-প্রকার জ্ঞানশূন্য অহেতুক ভালবাসা; রাধাকে তাই কবিরা বলেন "উন্মাদিনী রাধা"। পক্ষান্তরে, পুরুষের জ্ঞানের ভালবাসা এক-প্রকার রত্নচেনা চোকালো ভালবাসা; কৃষ্ণকে তাই কবিরা বলেন "চতুরচূড়ামণি"। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, "কৃষ্ণকে ভালবাসি জানি না সই আমি কিজন্য" এইরূপ জ্ঞানশূন্য অহেতুক ভালবাসা বড়, না "রাধা মূর্ত্তিমতী প্রেমমাধুরী, তাই আমি রাধার চরণ-কিঙ্কর" এইরূপ চোকালো-ধাঁচার সহেতুক ভালবাসা বড়? ইহার উত্তর এই যে, রাধার অহেতুক ভালবাসা প্রাণাংশে বড়, কৃষ্ণের সহেতুক ভালবাসা জ্ঞানাংশে বড়। হারজিতের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে,

ভিন্ন জাতির ভিন্ন রীত।
আপন মুলুকে সবায়'ই জিত।

ফলকথা এই যে, কৃষ্ণরাধিকার যুগবাঁধা প্রেম এ বলে আমায় দ্যাখ্, ও বলে আমায় দ্যাখ্; দুয়েরই মর্য্যাদা নিক্তির ওজনে সমান? যেহেতু জ্ঞানের পাওয়া এবং প্রাণের চাওয়া চখাচখীর ন্যায় সখাসখী। ভিতরের কথাটি তবে তোমাকে ভাঙিয়া বলি—

প্রাণ হইতে জ্ঞানে পৌঁছিবার মাঝপথে একটি সন্ধিস্থান আছে, সেইটিই ভালবাসা'র জন্মস্থান। সে স্থানটি হ'চ্চে মন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মন পদার্থটা কি? গঙ্গাজলই যেমন গঙ্গার সারসর্ব্বস্ব, তেম্নি, মানস বলিয়া যে-একটি মনোবৃত্তি আছে, তাহাই মনের সারসর্ব্বস্ব। মানস, সঙ্কল্প, ইচ্ছা, মন একই। তার সাক্ষী—"মন নাই" বলিলে বুঝায় ইচ্ছা নাই, "মনে ধরে না" বলিলে বুঝায় ইচ্ছার সঙ্গে মেলে না, "মন যায় না" বলিলে বুঝায় ইচ্ছা হয় না। পৃথিবীর ভূগোল তোমার নখাগ্রে, তাহা আমি জানি; তোমার জানিতে কেবল বাকি মনের ভূগোল; জানা কিন্তু উচিত—বিশেষত তোমার মতো পণ্ডিত-লোকের। অতএব প্রণিধান কর—

মন হ'চ্চে মানস-সরোবর বা ইচ্ছা-সরোবর, আর, তা'র দুই কূল হ'চ্চে জ্ঞান এবং প্রাণ। মনের যে-জায়গাটি জ্ঞানের কূল ঘেঁষিয়া তরঙ্গিত হয়, মানস সরোবরের সেই জ্ঞান-ঘ্যাঁসা কিনারাটি প্রভাবাত্মক বা প্রভুত্বপ্রধান বা পাওয়া-প্রধান ইচ্ছা, সংক্ষেপে ঈশনা; আর, মনের যে-জায়গাটি প্রাণের কূল ঘেঁষিয়া তরঙ্গিত হয়, মানস-সরোবরের সেই প্রাণঘ্যাঁসা কিনারাটি অভাবাত্মক বা অধীনতা-প্রধান বা চাওয়া-প্রধান ইচ্ছা, সংক্ষেপে বাসনা। মুখে সব কথা খোলোসা করিয়া বলিতে গেলে বড্ড বেশী বকিতে হয়, অথচ, বক্তা'র কেবল বকুনিই সার হয়—শুনিবেন যাঁহারা, তাঁহারা ঘড়ি-ঘড়ি স্ব স্ব গৃহের দিকে মুখ ফিরাইতে থাকেন। তাহাতে কাজ নাই। মানস-সরোবরের একখানি ক্ষুদ্র মানচিত্রের (একপ্রকার হাতচিটে'র) জোগাড় করিয়াছি, তাহা দেখিলেই সরোবরটি'র কূল-কিনারা'র ঠাহর পাইতে তোমার এক-মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইবে না; অতএব দেখ—

ও-কূল—জ্ঞান

ও-পারের কিনারা—ঈশনা বা পাওয়া-প্রধান ইচ্ছা

মানস-সরোবর বা সঙ্কল্প বা ইচ্ছা বা মন

এ-পারের কিনারা—বাসনা বা চাওয়া-প্রধান

ইচ্ছা

এ-কূল—প্রাণ

মানচিত্রে এ যাহা দেখিলে, তাহা যদি বাস্তবিক-মানস-সরোবরের সহিত হাতে-কলমে মিলাইয়া দেখিতে চাও, তবে চলো তোমাকে সরোবরটির এ-পার হইতে পাড়ি দিয়া ও-পারে লইয়া যাই, তাহা হইলেই তোমার ধন্দ মিটিয়া যাইবে।

একটু পূর্ব্বে তুমি যখন নিদ্রায় অচেতন ছিলে, তখন তোমার নিশ্বাসপ্রশ্বাস ঘড়ি'র কলের মতো বাঁধানিয়মে চলিতেছিল, ইহাতে আর ভুল নাই। ঘড়ি'র কল'কে তো চালায় জানি ঘড়ি'র স্প্রিঙ্—তোমার নিদ্রাবস্থায় তোমার নিশ্বাসপ্রশ্বাস চালাইতেছিল কে ? তোমার প্রাণ অবশ্য। তুমি তো নিদ্রায় অচেতন, আর, আমি সেই সময়ে তোমার শয়নঘরের এককোণে চেয়ারে হ্যালান্ দিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছি; ইতিমধ্যে তোমার নাক ডাকিয়া উঠিল গগনভেদী সপ্তমস্বরে—ডাকিয়া উঠিল অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় এম্নি সহসা যে, আমি চম্‌কিয়া উঠিলাম, আর, সেই মুহূর্ত্তে যে-ছোটো-ছেলেটি তোমার পার্শ্বে শুইয়াছিল, তাহার ঘুম ভাঙিয়া যাওয়াতে সে বিছানায় উঠিয়া-বসিয়া ভয়োদ্বিগ্নচিত্তে তোমার শব্দায়মান নাসিকার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তুমি তো সামান্য ডাক্তার নহ, তুমি মহামহোপাধ্যায় এম্-ডি; বলি তাই—সেই বছর-সাতেকের ছেলেটি তোমারই তো ছেলে! অ্যালোপাথিক্ ডাক্তারিবিদ্যায় সে পেট-থেকে-পড়িয়াই পণ্ডিত। সে ভাবিল যে, "বাবার নাকের ছিদ্র দিয়া প্রাণ বাহির হইতে চাহিতেছে—কিছুতেই আমি তাহা হইতে দিব না"; এইরূপ ভাবিয়া ছেলেটি তোমার নাক টিপিয়া ধরিল যতদূর তাহার সাধ্য শক্ত করিয়া। তাহার ফল যাহা হইল, তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি, শ্রবণ কর—

প্রথমে নিদ্রার ভাঙো-ভাঙো অবস্থায় তোমার দুঃস্বপ্নপীড়িত অর্দ্ধস্ফুট মনে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পথের বাধা সরাইয়া ফেলিবার ইচ্ছার উদ্রেক হইল; আর, সে যে ইচ্ছা, তাহা নিতান্ত অবলা ইচ্ছা—চাওয়া-প্রধান প্রাণঘ্যাঁসা ইচ্ছা—বাসনা-মাত্র। তাহার পরে তুমি ধড়্ফড়্ করিয়া জাগিয়া-উঠিয়া ছেলেটির হাতের কামড়্ হইতে তোমার নাসিকা ছাড়াইয়া লইতে ইচ্ছা করিলে; এবার'কার এ ইচ্ছা প্রভাবাত্মক সবলা ইচ্ছা—পাওয়া-প্রধান জ্ঞানঘ্যাঁসা ইচ্ছা; ইহারই নাম ঈশনা। যেই তোমার মনে জাগ্রত জ্ঞানের উদয় হইল, সেই-অম্নি ঈশনার পরাক্রমের চোটে ছেলেটির হস্ত হইতে তৎক্ষণাৎ তুমি তোমার বিপন্ন নাসাগ্র টানিয়া-লইয়া ছেলে-বেচারিটিকে এক-ধমকে কাঁদাইয়া ফেলিলে। মানস-সরোবরের এ-কূল হইতে ও-কূলে—প্রাণ হইতে জ্ঞানে—উত্তীর্ণ হইবার পথের ঠিক্-ঠিকানা এই তো তুমি হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া সুনির্ঘাত জানিতে পারিলে। পথ-অতিবাহনের ক্রম-পদ্ধতির বিবরণ এ যাহা তুমি জানিতে পারিলে, তাহা সংক্ষেপে এই—

স্থূল ক্রমপদ্ধতি।

(১) প্রাণ

(২) মন

(৩) জ্ঞান

সবিশেষ ক্রমপদ্ধতি।

(১) প্রাণ

(২) মন { (১॥০) প্রাণঘ্যাঁসা মন—বাসনা
(২) মন { (৩॥০) জ্ঞানঘ্যাঁসা মন—ঈশনা

(৩) জ্ঞান

পূর্ব্বপ্রদর্শিত মানচিত্রখানিতে ক্রম-পদ্ধতির অঙ্কচিহ্ন ছিল না। মানস-সরোবরের অমন একখানি সুন্দর নখদর্পণে অসম্পূর্ণতা-দোষ থাকিতে দেওয়া উচিত হয় কি? কোনোক্রমেই না; অতএব দেখ—

মানস-সরোবরের মানচিত্রের
দ্বিতীয় সংস্করণ।

(৩) ও-কূল—জ্ঞান

(৩॥ ·) পাওয়া-প্রধান জ্ঞানঘঁ্যাসা মন—ঈশনা

(২) মানস-সরোবর—মন

(১॥ ০) চাওয়া-প্রধান প্রাণঘঁ্যাসা মন—বাসনা

(১) এ-কূল—প্রাণ

প্রথমে পাওয়া হইয়াছিল মানস-সরোবরের কূলকিনারা'র সন্ধান, এক্ষণে পাওয়া হইল মানস-সরোবরের এ-কূল হইতে ও-কূলে পৌঁছিবার ক্রমপদ্ধতির সন্ধান। আর-দুইটি বিষয়ের সন্ধান পাইতে এখনো বাকি; সে দুইটি বিষয় হ'চ্চে—(১) ত্রিগুণ-রহস্য বা ব্যক্তাব্যক্ত-রহস্য এবং (২) দ্বন্দ্ব-রহস্য বা চাওয়া-পাওয়া'র বিচ্ছেদমিলনের ব্যাপ্যার। এ দুইটি রহস্য-ভাণ্ডারের কপাট-উদ্‌ঘাটন আগামী মাসে হাতে লওয়া যাইবে।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

সুন্দর।

শিল্পকলার ভেদনির্ণয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে শিল্পকলার লক্ষণ, উদ্দেশ্য ও নিয়ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নহে, প্রকৃতি ও প্রতিভার সাহায্যে মানব-চিত্ত যে আদর্শ-সৌন্দর্য্যের কল্পনা করে, সেই সৌন্দর্য্যকে স্বাধীনভাবে পুনরুৎপাদন করাই শিল্প-কলা। আদর্শ-সৌন্দর্য্য অসীমকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। যাহাতে প্রাকৃতিক সৃষ্টির ন্যায় মানব-রচনার মধ্যেও—বরং আরো বেশীমাত্রায়—অসীমের মোহন সৌন্দর্য্য প্রকটিত হয় তাহাই শিল্পকলার উদ্দেশ্য। কিন্তু কি করিয়া—কোন্ মায়া-মন্ত্রের দ্বারা, অসীমকে সসীম হইতে বাহির করা যাইতে পারে? ইহাই শিল্পকলার বাধা এবং ইহাই শিল্পকলার গৌরব। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে এমন কি আছে যাহা আমাদিগকে অসীমের দিকে লইয়া যাইতে পারে? ঐ সৌন্দর্য্যের যেটি মানসিক দিক্ সেই মানসিক আদর্শ-সৌন্দর্য্যই আমাদিগকে অসীমের দিকে লইয়া যাইতে পারে। সৌন্দর্য্যের এই মানস-আদর্শই আমাদিগকে সসীম হইতে অসীমে উন্নীত করে। অতএব, স্বকীয় মানস আদর্শকে বাহিরে প্রকাশ করার দিকেই যেন কলা-গুণীর নিয়ত চেষ্টা হয়। মানস-আদর্শই কলাগুণীর সর্ব্বস্ব। কলাগুণী আর যাহাই করুন,—তাঁহার রচনার বিষয়ের মধ্যে যে মানস-আদর্শ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তিনি সেই মানস-আদর্শটিকে প্রথমে ধরিবার চেষ্টা করিবেন; কেননা, তাঁহার বিষয়ের মধ্যে একটি মানস-আদর্শ অবশ্যই আছে। আদর্শটি একবার ধরিতে পারিলে তাহার পর কিসে এই আদর্শটি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়—মানব-চিত্তের গ্রাহ্য হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করিবেন। তাঁহার মানস-আদর্শকে বাহিরে প্রকটিত করিবার জন্য তিনি অবস্থানুসারে, প্রস্তর, বর্ণ, ধ্বনি, কিংবা শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এইরূপে, মানস-আদর্শকে ও অসীমকে কোন-না-কোন প্রকারে প্রকাশ করা—

ইহাই শিল্পকলার নিয়ম; শিল্প-রচনার যেটি প্রধান গুণ সেই ভাবব্যঞ্জকতার সাহায্যেই মানবচিত্তে সুন্দর ও অসীমের ভাব উদ্বোধিত হয়; এবং সুন্দর ও অসীম—এই দুই ভাবের সংস্রবেই শিল্পকলা শিল্পকলা নামের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

এই ভাবব্যঞ্জকতা-গুণটি আসলে মানস-আদর্শ-ঘটিত। যাহা চক্ষু দর্শন করে ও হস্ত স্পর্শ করে, তাহা ছাড়া এই ভাবব্যঞ্জকতা এমন একটা জিনিস অন্তরে অনুভব করাইবার জন্য প্রয়াস পায় যাহা অদৃশ্য ও অস্পৃশ্য।

শরীরের পথ দিয়া কিরূপে মন পর্য্যন্ত পৌঁছান যায়—ইহাই শিল্পকলার সমস্যা। বহিরিন্দ্রিয়ের অন্তরালে যে অন্তঃকরণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে সেই অন্তঃকরণে, সৌন্দর্য্যের দুরপনেয় ভাবরসটিকে উদ্দীপ্ত করিবার জন্যই শিল্পকলা বহিরিন্দ্রিয়ের সম্মুখে,—আকৃতি, বর্ণ, ধ্বনি, বাক্য প্রভৃতি আনিয়া উপস্থিত করে।

বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত যেরূপ আকৃতির সংস্রব, অন্তঃকরণের সহিত সেইরূপ ভাবের সংস্রব। ভিতরকার ভাব প্রকাশের পক্ষে আকার যেরূপ একমাত্র অমোঘ উপায়, সেইরূপ, আকারই আবার ভাবপ্রকাশের অন্তরায়। কলাগুণী, আকারের উপর সমস্ত রচনা-চেষ্টা প্রয়োগ করিয়া, স্বকীয় ধৈর্য্য ও প্রতিভার বলে, ঐ অন্তরায়কেই উপায়ে পরিণত করেন।

উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে সকল শিল্পকলাই একরূপ। যতক্ষণ কোন শিল্পকলা অদৃশ্যকে প্রকাশ না করে ততক্ষণ সে শিল্পকলাই নহে। একথা বারংবার আবৃত্তি করিলেও অত্যুক্তি হয় না যে, ভাবব্যঞ্জকতাই শিল্পকলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিয়ম। যাহা প্রকাশ করিতে হইবে তাহা একই জিনিস;—উহাই ভিতরকার ভাব, উহাই মন, উহাই আত্মা; উহা অদৃশ্য, উহা অসীম। প্রকাশ করিবার জিনিসটি এক হইলেও, যাহার নিকট উহাকে প্রকাশ করিতে হইবে সেই ইন্দ্রিয় গুলি বিভিন্ন। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নতাপ্রযুক্তই শিল্পকলা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে:—মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তিনটি ইন্দ্রিয়—রস গন্ধ ও স্পর্শের ইন্দ্রিয়—ইহারা আমাদের অন্তরে সৌন্দর্য্যরস উৎপাদন করিতে অসমর্থ। অন্য দুই ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া উহারা সৌন্দর্য্যরস উৎপাদনে সাহায্য করিতে পারে কিন্তু উহারা স্বয়ং উৎপাদন করিতে পারে না। যাহা কিছু মুখরোচক, রসনা শুধু তাহারই বিচার করিতে সমর্থ, কিন্তু সুন্দরের বিচার করিতে রসনা সমর্থ নহে। যে ইন্দ্রিয় শরীরের সেবায় অতিমাত্র নিযুক্ত, আত্মার সহিত তাহার যোগ তেমন ঘনিষ্ঠ নহে। উদরই রসনার প্রধান মনিব। রসনা উহারই তুষ্টি সাধনে—উহারই সেবায় নিয়ত নিযুক্ত। কখন কখন মনে হয় যেন ঘ্রাণেন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যরস গ্রহণে সমর্থ; তাহার কারণ, যে পদার্থ হইতে সৌরভ নিঃসৃত হয়, সে পদার্থটি হয়ত নিজেই সুন্দর এবং অন্য কারণে সুন্দর। সুন্দর গঠন ও উজ্জ্বল বর্ণবৈচিত্রের দরুণই গোলাপ ফুল সুন্দর। উহার গন্ধ সুখদ কিন্তু সুন্দর নহে। দৃষ্টির সাহায্য ব্যতীত স্পর্শ একাকী আকার-সৌষ্ঠবের বিচার করিতে সমর্থ হয় না।

পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অবশিষ্ট দুই ইন্দ্রিয়ই আমাদের অন্তরে সৌন্দর্য্যভাব উদ্দীপনে সমর্থ। এই দুই ইন্দ্রিয়ই যেন বিশেষরূপে আত্মার সেবায় নিযুক্ত। এই দুই ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি হইতে এমন

কিছু জিনিস আমরা প্রাপ্ত হই যাহা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ—অপেক্ষাকৃত মানসিক। আমাদের শরীর রক্ষার জন্য এই দুই ইন্দ্রিয় নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে। আমাদের ভরণপোষণের সাহায্য করা অপেক্ষা আমাদের জীবনের শোভাসম্পাদনেই উহারা অধিক সাহায্য করিয়া থাকে। উহারা আমাদিগকে যে প্রকার সুখ বিধান করে, শরীরের সহিত তাহার ততটা সংস্রব নাই। এই দুই ইন্দ্রিয়েরই সহিত শিল্পকলার যোগ নিবদ্ধ করা বিধেয়; এবং শিল্পকলা কার্য্যতঃ তাহাই করিয়া থাকে; এই দুই ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়াই শিল্পকলা মানব-চিত্তে প্রবেশ লাভ করে। এইজন্যই শিল্পকলা দুইটি বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে; শ্রবণেন্দ্রিয়ের শিল্পকলা ও দর্শনেন্দ্রিয়ের শিল্পকলা; একদিকে সঙ্গীত ও কবিতা; অপর দিকে, চিত্র-কলা, ভাস্কর-কলা, বাস্তু-কলা, উদ্যান-কলা।

আমরা শিল্পকলার মধ্যে বাগ্মিতা, ইতিহাস, ও দর্শনকে ধরিলাম না বলিয়া হয়ত কেহ কেহ বিস্মিত হইবেন।

শিল্পকলা ললিতকলা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। কেন না, দর্শক কিংবা শিল্পীর সাংসারিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কেবল নিঃস্বার্থ সৌন্দর্য্যের ভাব উৎপাদন করাই শিল্পকলার একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহাকে স্বাধীন শিল্পও বলে। কেন না, ইহা স্বাধীন লোকের শিল্প, দাসের শিল্প নহে। এই শিল্পকলা আত্মার মুক্তিসাধন করে, জীবনকে সুন্দর করিয়া তোলে, মহৎ করিয়া তোলে। এই কারণেই প্রাচীন গ্রীকেরা ইহাকে স্বাধীন শিল্প বলিত। এমনও কতকগুলি শিল্প আছে যাহার মহত্ত্ব নাই, আর্থিক প্রয়োজন—সাংসারিক প্রয়োজনই যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এইরূপ শিল্পকে ব্যবসায়-শিল্প বলা যায়। যেমন কুমোরের শিল্প, কামারের শিল্প। উহাতে প্রকৃত শিল্পকলা সংযোজিত হইতে পারে, শিল্পকলার দ্বারা উহার চাকচিক্য সাধিত হইতে পারে, কিন্তু সে কেবল একটা আনুষঙ্গিক কার্য্য।

বাগ্মিতা, ইতিহাস দর্শন—অবশ্য এই সমস্ত বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োজন; উহাদের যে গৌরব, উহাদের যে শ্রেষ্ঠতা, সে গৌরব ও শ্রেষ্ঠতাকে আর কিছুই অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু খুব ঠিক্ করিয়া বলিতে গেলে, উহারা শিল্পকলা নহে।

শ্রোতৃবর্গের অন্তরে নিঃস্বার্থ সৌন্দর্য্যের ভাব সঞ্চারিত করা বাগ্মিতার উদ্দেশ্য নহে। যদি কখন উহার দ্বারা কার্য্যত ঐ ফল উৎপন্ন হয়,—সে উহার স্বেচ্ছাকৃত চেষ্টায় নহে। কোন বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করা, কোন বিষয়ে প্ররোচনা করা—ইহাই বাগ্মিতার মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বকীয় মক্কেলকে রক্ষা করা কিংবা তাহার জয়লাভে সাহায্য করাই বাগ্মিতার কাজ; সে মক্কেল যেই হউক—হউক সে মনুষ্য, হউক সে কোন মতামত, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ভাগ্যবান সেই বাগ্মী যে লোকের মুখ হইতে এই কথা বাহির করিতে পারে—"উঁহার বক্তৃতাটি বড়ই সুন্দর!" ইহা যথেষ্ট প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু হতভাগ্য সেই বাগ্মী যে উহা ভিন্ন আর কিছুই লোকের মুখ হইতে বাহির করিতে পারে না; কেননা, কেবল সৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়া গেলে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ডেমসথিনিস্ রাষ্ট্রনৈতিক বাগ্মিতার ও বস্যুয়ে ধর্ম্মবিষয়ক বাগ্মিতার মহৎ আদর্শ; ইঁহাদের প্রতি দেশরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষার যে পবিত্র ভার

অর্পিত হইয়াছিল, কিসে সেই কর্ত্তব্য-ভার তাঁহারা সম্যকরূপে পালন করিবেন তাহাই তাঁহাদের একমাত্র চিন্তা ছিল; পক্ষান্তরে, ফিডিয়াস ও র‍্যাফেল কেবল সুন্দর বস্তুর উৎপাদনেই তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা নিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রকৃত বাগ্মিতা ও আলঙ্কারিক বাগ্মিতা—এই উভয়ের মধ্যে বহুল প্রভেদ। প্রকৃত বাগ্মিতা কার্য্যসিদ্ধির কতকগুলি উপায়কে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। অবশ্য লোকরঞ্জনে তাহার আপত্তি নাই—কিন্তু এমন কোন উপায়ে নহে যাহা তাহার অযোগ্য। যাহা তাহার অধিকার-বহির্ভূত—এরূপ অলঙ্কার প্রয়োগে তাহার অবনতি হয়। প্রকৃত বাগ্মিতার আসল লক্ষণ—সরলতা, গাম্ভীর্য্য; যাহা শুধু গাম্ভীর্য্যের ভাব ধারণ করে, গাম্ভীর্য্যের ভাণ করে, সেরূপ গাম্ভীর্য্যের কথা আমি বলিতেছি না;—সেত সর্ব্বপ্রকার প্রতারণার মধ্যে অধম প্রতারণা। যাহা অকপট হৃদয়ের গভীর বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন, সেই গাম্ভীর্য্যের কথাই আমি বলিতেছি। সক্রেটিস প্রভৃতি বাগ্মিতাকে এই ভাবেই বুঝিতেন।

বাগ্মিতার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, ইতিহাস ও দর্শন সম্বন্ধে সেই একই কথা বলা যাইতে পারে। দর্শনকার বলেন ও লেখেন। দার্শনিকও কি বাগ্মীর ন্যায় নানা রং ফলাইয়া মর্ম্মস্পর্শী জ্বলন্ত ভাষায় এমন করিয়া সত্যের ব্যাখ্যা করিতে পারেন না যাহাতে তাঁহার প্রতিপাদিত সত্য মানব-চিত্তে সহজে প্রবেশ লাভ করে? যে সকল উপায়ে তাঁহার কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে সেই সকল উপায় যদি তিনি অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে তিনি আপনিই আপনার কাজের হন্তারক হয়েন। এই স্থলে, কলানৈপুণ্য একটা উপায় মাত্র, দর্শনের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। অতএব ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, দর্শন—শিল্পকলা নহে। অবশ্য প্লেটো একজন কলাগুণী ছিলেন; প্যাস্‌কাল যেমন কোন-কোন স্থলে ডেমসথিনিস ও বস্যুয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী, সেইরূপ প্লেটো ও সোফোক্লিস্‌ও ফিডিয়াসের সমকক্ষ ছিলেন। কিন্তু আসলে উভয়ই সত্য ও ধর্ম্মের ঐকান্তিক সেবক।

বর্ণনা করিবার জন্যই বর্ণনা করা কিংবা চিত্র করিবার জন্যই চিত্রকরা ইতিহাসের উদ্দেশ্য নহে।

ইতিহাস এই জন্যই অতীতের বর্ণনা করে, অতীতের চিত্র অঙ্কিত করে যে তাহার দ্বারা ভাবীবংশের লোক জীবন্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারে। অতীত যুগের প্রধান প্রধান ঘটনার অবিকল চিত্র প্রদর্শন করিয়া, মানব ব্যাপারের মধ্যে যে সমস্ত ত্রুটি, যে সমস্ত গুণ, যে সমস্ত অপরাধ জড়িত রহিয়াছে তাহা বিবৃত করিয়া নব্যবংশীয়দিগকে উপদেশ দেওয়াই ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। দূরদৃষ্টি ও সাহস সম্বন্ধে ইতিহাস শিক্ষা দেয়। যে সকল মত গভীর চিন্তা হইতে প্রসূত হইয়া নিয়ত অনুস্যূত হইয়া আসিতেছে,—দৃঢ়ভাবে ও সংযত ভাবে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, ইতিহাস সেই সকল মতের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়। অসংযত অতিমাত্র উদ্যমের নিষ্ফলতা, জ্ঞান-ধর্ম্মের প্রচণ্ড শক্তি, বাতুলতা ও বদমাইসির অক্ষমতা—এই সমস্ত ইতিহাস জ্বলন্তভাবে প্রদর্শন করে।

থুসিডিডিস, পলিবস ও ট্যাসিটস প্রভৃতি ইতিহাস-লেখক শুধু আমাদের অলস কৌতূহল ও বিকৃত কল্পনা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত নহেন,—তা ছাড়াও তাঁহাদের আর কিছু করিবার আছে। অবশ্য লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে তাঁহারা অনিচ্ছুক নহেন; কিন্তু শিক্ষাদানই তাঁহা-

দের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁহারা রাষ্ট্রপরিচালকদিগের উপদেষ্টা ও মানবমণ্ডলীর শিক্ষাগুরু।

সুন্দর বস্তুই শিল্পকলার একমাত্র বিষয়। তাহা হইতে বিচ্যুত হইলেই, শিল্পকলা আত্মবিনাশ সাধন করে। অনেক সময় বাধ্য হইয়া শিল্পকলাকে বাহ্য অবস্থার অধীনতা স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহার মধ্যেও সে একটু স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলে। বাস্তু শিল্প ও উদ্যান-শিল্পই সর্ব্বাপেক্ষা কম স্বাধীন; উহারা কতকগুলি অনিবার্য্য বাধার অধীন। যেরূপ কবি, ছন্দ ও পদ্যের দাসত্বকেই অভাবনীয় একটি সৌন্দর্য্যের উৎসে পরিণত করেন, সেইরূপ বাস্তুশিল্পীও কতকগুলি অপরিহার্য্য বাধা সত্ত্বেও স্বকীয় প্রতিভা বলে তাহার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন। শৃঙ্খলের অতিমাত্র ভারে শিল্পকলা যেমন চূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ অতিমাত্র স্বাধীনতাতেও শিল্পকলা খামখেয়ালি ভাব ধারণ করিয়া অবনতি প্রাপ্ত হয়। সুখসুবিধার বেশী খাতির রাখিতে গেলে—তাহার অধীন হইয়া চলিতে গেলে—স্থাপত্যকলাকে বধ করা হয়। কোন বিশেষ প্রয়োজনের খাতিরে, বাস্তুশিল্পী অনেক সময়ে তাঁহার ইমারতের সাধারণ গঠন-কল্পনার সৌষ্ঠব ও সুপরিমাণ রক্ষা করিতে পারেন না। তখন বাহ্য অলঙ্কারের খুটিনাটিতেই তাঁহার সমস্ত শিল্পনৈপুণ্য পর্য্যবসিত হয়; তিনি শুধু ইমারতের অপ্রয়োজনীয় অংশেই তাঁহার গুণপনা দেখাইবার অবসর পান। ভাস্করকলা ও চিত্র-কলা, বিশেষতঃ সঙ্গীত ও কবিতা—ইহারা বাস্তুকলা ও উদ্যানকলা অপেক্ষা স্বাধীন। উহাদিগকেও শৃঙ্খলিত করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করা উহাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। (ক্রমশঃ)

আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে আচার্য্যের উপদেশের সারাংশ।

গৃহে ব্রহ্ম-পূজা।

আমরা ব্রাহ্ম হইয়া যে অপৌত্তলিক উপাসনা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, সে বড় কঠিন ব্রত। কেবল নিজে অশরীরী ঈশ্বরের উপাসক হইলে চলিবে না, গৃহে গৃহে ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠা করা আমাদের কার্য্য। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে পূজাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা ভাঙ্গা সহজ, কিন্তু নূতন করিয়া গড়িয়া তোলাই কঠিন। উপদেবতার আসনে অমূর্ত্ত ঈশ্বরকে স্থাপনা এবং জাগ্রত জীবন্ত দেবতা রূপে তাঁহার আরাধনা, এ বড় কঠিন সমস্যা। আমাদের জ্ঞানকে উন্নত করিতে হইবে, প্রীতিকে জাগ্রত ও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতে হইবে, তবেই ধ্যানবলে ঈশ্বরের সেই অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারিব। তবে কি বনে গিয়া একাকী ধ্যান করিতে হইবে? তাহা নহে। এ সাধনার জন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করিবার আবশ্যক নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম গৃহীর ধর্ম্ম। কোন কোন ধর্ম্মের আদর্শ জীবন-সন্ন্যাস; যেমন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম। পূর্ব্বকালে ঋষিগণও বনে গিয়া তপস্যা করিতেন; কিন্তু গৃহাশ্রমেই আমাদের বাস, আমাদের গৃহই তপোবন। "গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ" গৃহে থাকিয়া ইন্দ্রিয় সংযমের নামই তপস্যা। সন্ন্যাস অবলম্বন না করিয়া, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইয়া, পরিবারের মধ্যে অমূর্ত্ত ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠা করা, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের নববিধান। সংসার ছাড়িয়া ধর্ম্মসাধন করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু সংসারে থাকিয়া বিবিধ বিঘ্ন-বিপত্তি-প্রলোভনের মধ্যে ধর্ম্মসাধন করা সুকঠিন। শুধু যদি আমি ঠিক পথে চলি, তাহা হইলে হইবে না,

আর সকলকে ঠিক পথে রাখিতে হইবে, নিজের দায়িত্ব বুঝিয়া সাধুভাবে ও পবিত্র-ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, এবং আপনার পবিত্র জীবনের আদর্শ সকলের সমক্ষে ধারণ করিতে হইবে, তবেই পৌত্তলিক সমাজে দৃঢ়রূপে এবং স্থায়ী-ভাবে অনন্ত-দেবের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইব।

আমাদের দুইগতি; এক কেন্দ্রাভিমুখী, অপর কেন্দ্র-বহির্মুখী। গ্রহ যেমন কেন্দ্রাভিমুখী গতিতে আপনার চারিদিকে ঘুরে এবং কেন্দ্রাতিগ গতিতে স্বীয় কক্ষে ভ্রমণ করে, আমাদের গতিও সেইরূপ। একদিক দিয়া আত্মোন্নতি সাধন করা, অপর দিকে পর-সেবা—স্বদেশ-সেবায় প্রবৃত্ত হওয়া। আমরা যদি কেবল আত্মসুখের পথ অনুসরণ করি, তাহা হইলে গম্যস্থানে কিছুতেই পৌঁছিতে পারিব না। বিপরীত ফল উৎপন্ন হইবে—সুখ মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় পলায়ন করিবে। প্রকৃত সুখ যদি চাও, শ্রেয়ঃ পথের পথিক হও—কর্ত্তব্য-সাধনের পথ অবলম্বন কর। বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষেরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন—আত্মসুখ তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না; তাঁহাদের বৈরাগ্যের কারণ পর-দুঃখ-নিবারণ। আত্মোন্নতি পরসেবার সঙ্গে জড়িত, ইহা যেন আমরা কিছুতেই বিস্মৃত না হই। আত্মসুখ লক্ষ্য করিলে আত্মোন্নতি হয় না। পরের জন্য আত্ম-ত্যাগই—আত্মোন্নতির সোপান। কর্ত্তব্য সাধন করিতে থাক, ক্রমেই আত্মশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে; এবং সেই আত্ম-শক্তিকে লোকের মধ্যে—সমাজের মধ্যে সাধু-কর্ম্মের উদ্দেশে প্রয়োগ করিতে হইবে। আপনি ভাল হওয়া ও অন্যকে ভাল করা সংক্ষেপতঃ ইহাই ধর্ম্মের লক্ষণ।

আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তীর্ণ। গৃহে থাকিয়া পিতা মাতাকে সেবা করিতে হইবে, স্ত্রী পুত্রকে প্রতিপালন করিতে হইবে, স্বজন-বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের চারিদিকে দুঃখ দারিদ্র্য রোগ-শোক পাপ-তাপ রহিয়াছে। তৎ-সমস্ত প্রশমন করিবার চেষ্টা কর। রোগীর সেবা, বিপন্নকে উদ্ধার, অনাথ আতুরকে আশ্রয় দান, অন্যায় অত্যাচার হইতে নির্দ্দোষির সংরক্ষণ, সংসারে থাকিয়া এই ভাবে কর্ত্তব্য সাধন কর; তবেই ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিতে পারিবে।

ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের পরিত্রাণ নাই। দুর্ব্ব-লতা আমাদের পদে পদে। বিপদ ও প্রলোভন চারিদিকে। এমন অনেক অবস্থা আছে, এমন অনেক শোকের কারণ আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন মানুষে সান্ত্বনা দিতে পারে না। পরিবর্ত্তনশীল সংসার-চক্রে আমরা বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়া নিয়তই ঘুরিতেছি। "অদ্য রাজা, কল্য দরিদ্র, অদ্য মহোল্লাস, কল্য হাহাকার, অদ্য অভিনব-বিকশিত-পুষ্পতুল্য লাবণ্য-যুক্ত, কল্য ব্যাধি দ্বারা শুষ্ক ও শীর্ণ;" অদ্য রূপবতী গুণবতী প্রিয়বাদিনী ভার্য্যার সহিত প্রেমালাপ; কল্য তাহার মৃতদেহো-পরি অশ্রু-বিসর্জ্জন, আজ স্বামীর মৃত্যু, কল্য হয়ত বিধবার নয়নের মণি হৃদয়ের আনন্দ একটিমাত্র পুত্রের বিয়োগ! এই সকল স্থলে শান্তি কোথায়? কে আমা-দিগকে সান্ত্বনা দিবে? ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র শান্তিদাতা। যখন আর সকলে চলিয়া যায়, তিনিই আমাদের চির-আশ্রয় বিরাজিত থাকেন। সেই যে অন্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মা তাঁহাকে প্রীতি কর। যে ভাগ্যবান্ পুরুষ তাঁহাতে প্রীতিস্থাপন করেন, তাঁহার সে প্রিয় কখনও মরণশীল হন

না। পৃথিবীর প্রিয়বস্তু সকলই চলিয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরকে যদি আমরা প্রিয় করিয়া লইতে পারি, তবে সেই প্রিয়বস্তুর আর বিনাশ কোথায়!

যিনি ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে পারেন ও সেই প্রীতির উদ্দেশে মনুষ্যের হিতকর্ম্ম সাধন করিতে পারেন, তিনিই ভাগ্যবান্। ঈশ্বরকে প্রীতি এবং তাঁর প্রিয় কার্য্য-সাধন, ইহাই সকল ধর্ম্মের সার কথা। ধর্ম্ম কেবলমাত্র ঔষধ নহে—কিন্তু উহা আমাদের নিত্য-আহার। ধর্ম্ম আমাদের জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। জীবনে মরণে ধর্ম্মের সহিত আমাদের নিত্যযোগ। আমাদের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমের আদর্শ এই যে "যদ্ যদ্ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ" এখানে যে কিছু কর্ম্ম করিবে, তাহা ব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবে। তাহা যদি করিতে পার, তোমার জীবনে মরণে ভয় নাই। তোমার কর্ত্তব্য সাধন করিতে করিতে যদি মৃত্যু আইসে, তাহাতে কি? আমরা যেখানে যাইব, সেই মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বর আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবেন। তাঁহাতে বিশ্বাস কর, তাঁহার উপর নির্ভর কর, তাঁহার জন্য জীবন দিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন কর। তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে গিয়া যদি দেহ অবসান হয়, তবে সে মৃত্যু তাঁহারই অমৃত ক্রোড়ে আমাদিগকে লইয়া যায়। "মৃত্যু সে অমৃত সোপান"।

অতএব সকলে সাধুকর্ম্মে উৎসাহী হও। "ব্রহ্মাভয়ং" অভয়দাতা ঈশ্বর তোমার সম্মুখে, তিনি তোমার অন্তরে। জ্ঞানে প্রেমে পবিত্রতায় আপনাকে উন্নত করিয়া পরোপকারে—স্বদেশ ও স্বজাতির কার্য্যে জীবনকে উৎসর্গ কর, ঈশ্বরের সমক্ষে নির্ভীক-চিত্তে জীবন যাপন কর, তবেই তাঁহার অমোঘ আশীর্ব্বাদ তোমার মস্তকে উপর নিপতিত হইবে। তোমার জীবন ধন্য হইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ।

খৃষ্টধর্ম্ম উদার ধর্ম্ম হইলেও তাহার ভিতরে এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহা বাহ্যিক প্রমাণ-সাপেক্ষ। খৃষ্টের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, তাঁহার সশরীরে পুনরুত্থান প্রভৃতি বহুতর বিষয় বিশ্বাস করিতে হয়, অথচ ঐ সকল ব্যাপার বাহ্য-প্রমাণে দাঁড়াইতে পারে না, অন্তরাত্মা হইতেও সায় পায় না। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজে যাহা আছে, দেখ তাহা কেমন সহজ, কেমন উদার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেমন করিয়া যে ঐ কয়েকটি বীজ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বরচিত জীবনীতে সুস্পষ্ট বিবৃত আছে। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজে কি পাইয়াছি? এই যে, এক অনন্ত ঈশ্বর এবং অপৌত্তলিকভাবে তাঁহার উপাসনা। ঈশ্বরের উপাসনা কি—তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধন করা। এই যাহা আভাস দেওয়া গেল, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় হইতে পারে। ভক্তি-প্রধান ধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্ম, জ্ঞান-প্রধান ধর্ম্ম—উপনিষদ্, গীতোপদিষ্ট কর্ম্মপ্রধান ধর্ম্ম এই তিনই ব্রাহ্মধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইতেছে। আমাদের এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্রিবেণীসঙ্গম। ইহাতে জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম সকলেরই মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মই বস্তুতঃ সকল ধর্ম্মের সাধারণ ঐক্য-স্থল। ব্রহ্মপ্রীতি এক দিকে, কর্ত্তব্য আর এক দিকে; এই উভয়ই ব্রাহ্মধর্ম্মে স্থান পাইয়াছে। ধর্ম্মকে যদি দেহ রূপে কল্পনা করা যায়, তাহার অস্থি হইতেছে

কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা; এবং রক্তমাংস ও জীবনী-শক্তি হইতেছে—প্রীতি। এই দুয়েরই মিল—জীবনে। ব্রহ্ম আমাদের আরাধ্য দেবতা। মূর্ত্তিপূজার পরিবর্ত্তে আমরা ব্রহ্মপূজা পাইয়াছি। অচেতন দেব-প্রতিমায় চক্ষুকর্ণ চিত্রিত আছে;কিন্তু সে দেখে না,শোনে না। কিন্তু ব্রহ্ম যিনি,তিনি জাগ্রত-জীবন্ত দেবতা। তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ,তিনি জগতের স্রষ্টা, তিনি ওতপ্রোতভাবে সকলেতেই ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। সেই যে বিধাতা পুরুষ, তাঁহার 'জ্ঞান-বল-ক্রিয়া স্বাভাবিকী'; তাঁহার কর্ম্মের বিরাম নাই, তিনি নিদ্রিত নহেন, তিনি জাগ্রত। তিনি ক্ষণকালের নিমিত্তে কর্ম্ম হইতে বিরত হইলে বিশ্বসংসার ছারখার হইয়া যায়। তাই গীতা বলিতেছেন

নমে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি।
যদি হ্যহং নবর্ত্তেযং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিত:।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহং
সঙ্করস্য চ কর্ত্তাস্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।

৩য় অধ্যায়।

ত্রিলোকে কি দেখ পার্থ কর্ত্তব্য আমার।
কি আছে পাইনি যাহা, আছে কি পাবার?
তবু যদি তন্দ্রাহীন কর্ম্ম নাহি করি,
লোকে যায় অধঃপাতে সেই পথ ধরি।
আমি না করিলে কর্ম্ম সবে কর্ম্ম ছাড়ে
কর্ম্মলোপে ধর্ম্মলোপ হয় এ সংসারে।
বরণসঙ্করে হয় ভ্রষ্ট প্রজাকুল,
কর্ম্মেতে ঔদাস্য যত অনর্থের মূল।

তিনি সর্ব্বব্যাপী, দেশেতে অনন্ত, কালেতে অনন্ত, "স এবাদ্য সউশ্বঃ" তিনি অদ্যও আছেন, পরেও থাকিবেন। যখন কিছুই ছিল না, তিনি ছিলেন; যদি সকলি যায়, তিনি থাকিবেন। মৃত্যুর অধিকার তাঁহাতে নাই। তিনি চির-সহায়, তিনি চিরকালের উপজীবিকা।

তাঁহাকে সাধন দ্বারা জানিতে চেষ্টা কর, ব্রহ্মদর্শন অভ্যাস কর, তাঁহাতে বিশ্বাস কর, তাঁহার বাণী শ্রবণ কর, তাঁহার আদেশ পালন কর। শ্রবণ কর, তিনি বলিতেছেন "ভয় নাই ভয় নাই, আমি তোমাকে আশ্রয় দিব।" বিপদে ধৈর্য্য শিক্ষা কর। ভয়-বিপদে শোক-তাপে তিনি আমাদের সহায়। তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপে আস্থাবান্ হও। তিনি যাহা করেন, তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্য করেন। যদি আমাদের প্রাণ যায়, তথাপি আমরা তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপে বিশ্বাস হারাইব না। তাঁহাকে পাইয়া আমরা অমৃতের অধিকারী হইয়াছি। তিনি আমাদের দিব্য-চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া দিন। তিনি সত্যের আলোক প্রকাশ করুন,তাঁহার সেই আলোকে গন্তব্য পথ সম্মুখে প্রসারিত দেখিয়া যেন আমরা ক্রমিকই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে পারি, তিনি এইরূপ আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

সেখ সাদি।

তিনিই ঈশ্বরের প্রকৃত সেবক, যিনি আপনার ত্রুটি অনুভব করিয়া ঈশ্বরের দ্বারে নিয়তকাল ক্ষমা ভিক্ষা করেন। হায়! আমাদের এমন কি আছে, যাহা ভরসা করিয়া ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করিতে পারি।

তাঁহার করুণার অজস্রধারে আমরা অভিষিক্ত। বিশ্বব্যাপী প্রাচুর্য্য তিনি সকলেরই সম্মুখে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন! মেঘ-বায়ু চন্দ্র-সূর্য্য সকলে তাঁহার আজ্ঞা বহন করিতেছে। সকলেই তাঁহার আজ্ঞাবহ। আহার-পান লাভ করিয়া কেবল তুমিই কি তাঁহার প্রতি উদাসীন থাকিবে?

তাঁহার প্রতি বিশ্বাসের দুর্গ কেন বিকম্পিত হইবে, মানব। তুমি যদি তাহার স্তম্ভ হইয়া দাঁড়াও।

যদি কেহ আমাকে ঈশ্বরের গুণ ব্যাখ্যা করিতে বলে, আমি নীরব হইয়া পড়ি। আমি অন্বেষণ করি, তাঁহার তুলনা খুঁজিয়া পাই না।

প্রতি নিঃশ্বাসে জীবন ক্ষয় হইতেছে, অল্পই আর অবশিষ্ট আছে। জীবনের ৫০ বৎসর অতিবাহিত হইল, এখনও সুখ স্বপ্ন দেখিতেছ? কার্য্য শেষ করিতে পারিলে না? ধিক্ তোমাতে!

বিদায়ের ঘণ্টা বাজিতেছে, এখনও যাত্রার সম্বল (baggage) ঠিক করিয়া লইতে পারিলে না? প্রাভাতিক তন্দ্রায় এখনও বিভোর। হায়! কখন্ যাত্রায় বাহির হইবে।

রূপ-যৌবনে বিভোর হইও না। সকলেই চলিয়া যাইবে। তিনিই ধন্য, যিনি এখানে থাকিয়াই ধর্ম্মের পুরস্কার লাভ করিতে পারিলেন।

ভাবী-জীবনের সম্ভোগ-সামগ্রী অগ্রেই পাঠাইয়া দিও, যে, পরলোকে গিয়া উপভোগ করিতে পাইবে।

মনুষ্য-জীবন বরফের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। তাহার উপর সূর্য্য খর-কিরণ ঢালিতেছে। গর্ব্ব অহঙ্কার সকলই মিলাইয়া যাইবে। এ জীবনত তোমার সর্ব্বস্ব নয়।

হায়! শূন্য-হস্তে তুমি বাজারে যাইতেছ! মাথার টুপি ফিরাইয়া আনিতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে না।

জিহ্বাকে সংযত করিতে পারিতেছ না। যাহারা জিহ্বাহীন (বোবা), তাহারা তোমা অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ নহে?

বাক্‌শক্তির জন্য মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা। প্রলাপ বকিলে ইতর জন্তুগণ কি তোমার উপর প্রাধান্য লাভ করে না?

অহঙ্কারে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছ; শত্রুগণ তোমাকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিবে। কিন্তু সাদির মস্তক বিনয়ে অবনত; তাহার শত্রু কোথায়?

অগ্রে চিন্তা কর, পরে বাক্য কহিও। অগ্রে ভিত্তি, তাহার উপর অট্টালিকা; ইহা যেন মনে থাকে।

অন্ধের নিকট জ্ঞান শিক্ষা কর। তাহারা যষ্টির সাহায্যে অগ্রে পথ পরীক্ষা করিয়া পরে পদ-নিক্ষেপ করে।

পৃথিবী চিরকালের জন্য নহে। পার্থিব বিষয়ের উপর নিজ সুখশয্যা রচনা করিও না। রাজ-সিংহাসনেই অধিষ্ঠান কর, আর পর্ণ কুটীরেই বাস কর, সকলকেত যাইতেই হইবে।

কত শত বীর-পুরুষ ভূগর্ভে কবরস্থ। হায়! তাহাদের একখানি অস্থিও এখন খুঁজিয়া মেলে না। দয়া-ব্রতেই জীবনের প্রকৃত সম্ভোগ ও অমরত্ব।

জগতের বৃহৎ বস্তুমাত্রই মূল্যবান নহে। সিনাই পর্ব্বত ক্ষুদ্র হইলেও মহা গৌরবে পূর্ণ। আরবীয় অশ্ব ক্ষুদ্র হইলেও সকলের আদরের সামগ্রী।

একখানি রুটি পাইলে সাধু নিজে অর্দ্ধাংশ ভোজন করিয়া অপরার্দ্ধ দরিদ্রকে দান করে। হায়! রাজা একটী রাজ্য জয় করিয়া সন্তুষ্ট নহে, অপরের রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য সে লালায়িত।

ক্ষুদ্র-বৃক্ষকে সহজে উৎপাটন করিতে পার, বড় হইলে তোমার সাধ্যে কুলায় না। বাঁধের ছিদ্র সহজে রোধ করিতে পার; কিন্তু সে বাঁধ একবার ভাঙ্গিয়া গেলে, হস্তিপৃষ্ঠে সে অপ্রতিহত জলস্রোত পার হওয়া যায় না।

দীপ্যমান অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারকে অবহেলা করিও না।

সর্পকে বিনাশ করিয়া শিশুসর্পকে বাড়িতে দিও না। যাহা কিছু মন্দ, সমূলে তাহার ধ্বংস-সাধন কর।

হিংসুক! মৃত্যুই তোমার খল-রোগের ঔষধ। দুর্ভাগ্যেরা সৌভাগ্যবানের পতন দেখিতে চায়। বাদুড়ের চক্ষু সূর্য্য-কিরণ সহ্য করিতে পারে না। সূর্য্য কি তাহার জন্য দোষী? এরূপ শত সহস্র চক্ষু পীড়িত হউক, তাহাও ভাল, কিন্তু সূর্য্যকিরণ যেন ম্লানভাব ধারণ না করে।

দুর্দ্দিনে যিনি বন্ধু পাইতে চান, সম্পদের সময় তিনি বদান্যতা অভ্যাস করুন। সদয় ব্যবহার না পাইলে অনুরক্ত দাসও তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। স্নেহ-দয়ায় অপরিচিতও তোমার সেবক হইয়া দাঁড়াইবে।

নানা কথা।

সংস্কৃত-বিদ্যালয়।—দ্বারবঙ্গ মহারাজ, প্রধানা মহিষী শ্রীমতী রামেশ্বরলতার নামে দ্বারবঙ্গ নগরে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয়, বিগত ১২ই জুলাই তারিখে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সম্প্রতি ঐ বিদ্যালয়ে বেদ দর্শন, ন্যায়, মন্ত্রশাস্ত্র, ব্যাকরণ, বৈদ্যগ্রন্থ এবং সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইবে। মহারাজা আশা করেন, মহর্ষি জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-গৌতম এবং পুণ্যশ্লোকা সীতা-গার্গী-মৈত্রেয়ীর অভ্যুদয়ে শ্লাঘ্য মিথিলা-ভূমিতে দেশ বিদেশীয় ছাত্রের অসদ্ভাব হইবে না। অনেকগুলি উপনিষদের সংরচন-ক্ষেত্র এই মিথিলা। মানব-আত্মার অমরত্ব বহুকালপূর্ব্বে এইখানেই বিঘোষিত। রাজর্ষি জনকের ব্রহ্মতত্ত্ব এইখানেই উৎগীরিত। কিন্তু বর্ত্তমানে হায়! গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই। প্রাচীন ঋষিগণ যে অমূল্য ধনসম্পত্তি শাস্ত্রের ভিতরে নিহিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, অনেকেই তাহার স্বাদ-গ্রহণে অসমর্থ —নিতান্তই দীন। যিনি জাতীয় এই ঘোর দৈন্য ঘুচাইবার জন্য এইরূপ উচ্চ অঙ্গের সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মুক্তহস্ত, তিনি সমগ্র হিন্দুজাতির কৃতজ্ঞতা-ভাজন। মহারাজা বাহাদুর সার রামেশ্বর সিং, কে, সি, আই, ই, স্বয়ং এই বিদ্যালয়ের পরিদর্শক এবং শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ ইহার সম্পাদক। যাঁহারা এই বিদ্যালয়ের নিয়ম প্রণালী জানিতে চাহেন, সম্পাদকের নামে দ্বারবঙ্গে পত্র লিখিলে সমস্তই জানিতে পারিবেন। আমরা এই বিদ্যালয়ের দীর্ঘ-জীবন কামনা করি।

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্ব্বে যে ব্রহ্মবিদ্যালয় আদি-ব্রাহ্মসমাজে স্থাপন করেন এবং স্বয়ং মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যাহার উপদেষ্টা ছিলেন, তাঁহাদের সেই পবিত্র স্মৃতির সহিত নবস্থাপিত এই ব্রহ্মবিদ্যালয় অনুস্যূত। ডাক্তার পি, কে, রায়, ইহার পরিদর্শক; শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, অম্বিকা চরণ সেন, ধর্ম্মানন্দ কুমুর্ষি, হেমচন্দ্র সরকার অপাততঃ এই বিদ্যালয়ে উপদেশ দিবেন। মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান এই বিদ্যালয়ের সভাপতি, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র নাথ সেন সহযোগী সম্পাদক ও হেমচন্দ্র সরকার সহকারী সম্পাদক মনোনীত হইয়াছেন। এক্ষণে বর্দ্ধমানাধিপতি মাসিক ৩০০৲ টাকা ও অন্যান্য কেহ কেহ অর্থ সাহায্য করিতেছেন। মনোবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, ভারত ইতিহাস, ধর্ম্মতত্ত্ব, ভগবদ্গীতা, ভারতে ধর্ম্ম-বিকাশ, এবং বিবিধ ধর্ম্ম শাস্ত্রের সারমর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয় এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষা ৩ বৎসরব্যাপী এবং এই প্রথম বৎসরের জন্য ব্রহ্মবাদ, মনোবিজ্ঞান, উপনিষদ, ধম্মপদ প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাইবে। ছাত্রবৃত্তি মাসিক ১৫৲ টাকা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে; বৃত্তি-ভোগী চারি জন ছাত্র বিদ্যালয়ে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছেন। বাহিরের আরও কতিপয় ছাত্র উপদেশের সময় উপস্থিত থাকেন। এই বিদ্যালয়ের ইংরাজি নাম Theological College for all India অর্থাৎ সমগ্র ভারতের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কালেজ দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে এই নামের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়, তাহার দিকে অধ্যক্ষদিগের যেন দৃষ্টি স্থির থাকে, ইহাই আমাদের কামনা। হিন্দু সমাজের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিলে বিদ্যালয় লাভবান্ হইবেন। হিন্দু-দর্শন ও বৈষ্ণব-শাস্ত্র, অধীত বিষয়ের মধ্যে স্থান পাইলে বিদ্যালয়ের গৌরব আরও বর্দ্ধিত হইবে, কেমনা দর্শনের প্রভাব উচ্চ অঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলীর ভিতরে অস্থিমজ্জাগত, এবং বৈষ্ণবসংখ্যাও সমগ্র ভারতে নিতান্ত অল্প নহে। দুই এক জন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রেণীর ভিতরে থাকিলে ভাল হয়। ব্রহ্ম-বিদ্যালয় অল্পদিনই হইল উন্মুক্ত হইয়াছে। কালক্রমে ইহার ত্রুটি-বিরহিত পূর্ণাবয়ব বিকশিত হইবে, আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস।—১৮৫৯ খৃঃ অব্দে কলিকাতা ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে উপদেশ দিতেন, তাহা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিপিবদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস এই নামে প্রকাশ করেন। ব্রাহ্ম-সাহিত্যের ভিতরে এই গ্রন্থের স্থান অতীব উচ্চে। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি, যাঁহারা বুঝিতে চাহেন, এই পুস্তক হইতে তাঁহারা বিশেষ সাহায্য পাইবেন।

স্থফি-সম্প্রদায়।—মুসলমানদিগের মধ্যে একটি দল আছে, যাহারা কতক পরিমাণে বৈদান্তিক ধর্ম্মাবলম্বী, উহাদিগকে স্থফি বলে। তাহাদিগের মতে ঈশ্বর সমস্ত বস্তুর মধ্যে বিরাজমান। মনুষ্যের আত্মা ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, কিন্তু তাঁহারই এক অংশ। আত্মাকে ক্রমিকই উন্নত কর, যে পর্য্যন্ত না সে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয়। মনুষ্যের আত্মা কিছু দিনের জন্য এখানে আসিয়াছে; সে এখানে পথিক; সে আবার তাঁহাতেই মিলিত হইবে। স্থফিদিগের সাধনের প্রথম অবস্থায় ঈশ্বরের কার্য্য কর; দ্বিতীয় অবস্থায় ঈশ্বরের প্রেম লাভ করিয়া সংসারিক সকল কামনা বিসর্জ্জন দাও; তৃতীয় অবস্থায় নির্জ্জনে তাঁহার সাধনা কর; তাঁহার স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে চতুর্থ অবস্থায় তাঁহার জ্ঞানলাভ কর; পঞ্চম অবস্থা পরমানন্দের অবস্থা; ষষ্ঠাবস্থায় ঈশ্বরের নিকট হইতে সাধক নিজেই সত্য (হকিকৎ) লাভ করিতে থাকে; পরবর্ত্তী সপ্তম অবস্থায় ঈশ্বরের সহিত সে মিলিতে থাকে; ৮ম অবস্থায় সে ঈশ্বরে এক কালে বিলীন হয়, এবং আত্মারূপ পথিকের সকল যাত্রার অবসান হয়। প্রেমের অবস্থা বর্ণনা করিতে স্থফিকবিগণ বড়ই সিদ্ধহস্ত। স্থফি হইল যাত্রী, সে প্রেমিক, ঈশ্বর তাহার প্রেমের বস্তু। যাত্রার একএকটি সোপানের নাম পান্থশালা; সাধকের আনন্দ ক্রমে উন্মত্ততার সীমায় গিয়া পৌঁছে। অনেক পার্শী ও পস্তু কবি এই প্রেমের বর্ণনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। সময়ান্তরে আমরা স্থফিকবি হাফেজের অমূল্য গ্রন্থ হইতে তাঁহার ধর্ম্মোন্মত্ততার ও ঈশ্বর প্রেমের পরিচয় দিব।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৮, জ্যৈষ্ঠ মাস।

আদি-ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৫২৬।০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৬৬৩৸৵০
সমষ্টি	...	৩১৯০ ৵০
ব্যয়	...	৫৪৪ ৻৯
স্থিত	...	২৬৪৬ ⁄৩

জায়

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
ছয়কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৪০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত
২৪৬ ⁄৩

২৬৪৬ ⁄৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ৩৬৫৲

মাসিক দান।

স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের এষ্টেটের এক্জীকিউটার মহাশয়গণ
২০০৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু জানদা প্রসাদ বড়ুয়া
১০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু কামনা কুমার সিংহ
৫৲

পরলোকগত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত বেঙ্গল বণ্ডেড ওয়ার হাউসের সেয়ারের ডিভিডেণ্ট আদায়, মাঃ শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়
৫০৲
কোম্পানীর কাগজ ক্রয়
১০০৲

... ৩৬৫৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১১।৵০
পুস্তকালয়	...	৸০
যন্ত্রালয়	...	১৪৩০।৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	৮৸০
সমষ্টি	...	৫২৬।০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৭৭৸৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৮৸৶০
পুস্তকালয়	...	। ৬
যন্ত্রালয়	...	২৩৬৸৵৩
সমষ্টি	...	৫৪৪ ৻৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৮, আষাঢ় মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৫২০। ৩
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৬৪৬ /৩
সমষ্টি	...	৩১৬৬।/৬
ব্যয়	...	৩৬৭৸৩
স্থিত	...	২৭৯৮৷৷/৩

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
ছয়কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৪০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

৩৯৮৷৷/৩

২৭৯৮৷৷/৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ২০৫৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষিদেবের এষ্টেটের একজিকিউটার মহাশয়গণ

২০০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশ চন্দ্র মল্লিক

২৲

শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র

১৲

শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল চন্দ্র দে

২৲

২০৫৲

পুস্তকালয়	...	৯৮/৬
যন্ত্রালয়	...	৩০৫।৶৯
সমষ্টি	...	৫২০। ৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৩৩৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৩।৶০
পুস্তকালয়	...	৶৬
যন্ত্রালয়	...	১৯৫৷৷/০
ব্রাহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৫৷৷৯
সমষ্টি	...	৩৬৭৸৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

১৮২৯ শকের ১লা শ্রাবণ হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ, ট্রষ্টীগণের আদেশে নিম্নলিখিত আচার্য্য ও কর্ম্মচারীগণ নিযুক্ত হইলেন।

আচার্য্য ও সভাপতি।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উপাচার্য্য।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী।
„ চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।
„ যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

কর্ম্মাধ্যক্ষ ও ধনরক্ষক।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী।

সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

গায়ক।

শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী।
„ শ্যামসুন্দর মিশ্র।

বাদক।

„ কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।
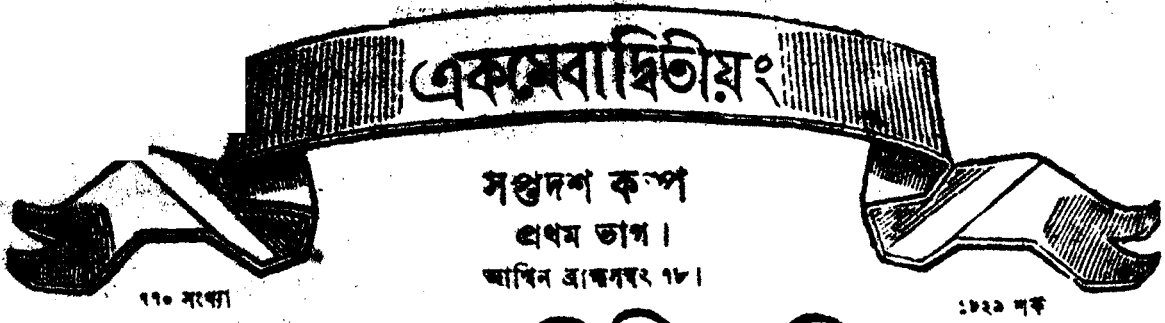
ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

জীবের জন্মকাল।

এই জলস্থলময় পৃথিবী কতদিনপূর্ব্বে জীবাবাসের উপযোগী হইয়াছিল, তাহা স্থির করিবার জন্য গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন। অনেক বৈজ্ঞানিক নানা জ্যোতিষ্কলোকে অগ্নিভুক্ ও শিলাময় জীবের কল্পনা করিয়াছেন; বলা বাহুল্য সে সকল কথা কেবল মাত্র কল্পনা-প্রসূত। পৃথিবীতে কোনকালে ঐ প্রকার কাল্পনিক জীব ছিল কি না, আমরা তাহার আলোচনা করিব না। যাহাদের শরীর নাইট্রোজেন্‌মিশ্রিত-জীবসামগ্রী (Protoplasm) দ্বারা গঠিত এবং যাহারা বায়ু বা জলস্থিত অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া, সেই জীব-সামগ্রীর সহিত তাহার রাসায়নিক সংযোগ করাইয়া সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ করে, আমরা এখানে তাহাদিগকেই জীব বলিব। লোকান্তরে বা গ্রহান্তরে কোনও অদ্ভুত জীব আছে কি না, এবং তাহাদেরই কোনও বংশধর আমাদের পৃথিবী-খানিতে কোন কালে বাসা বাঁধিয়াছিল কি না, তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই, আমাদের পরিচিত জীবগুলিকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, তাহাদের আবাসভূমির অবস্থা জীবনরক্ষার অনুকূল হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে, কোন জীবই টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। চতুষ্পার্শ্ব যদি বরফের ন্যায় শীতল হয়, তবে উদ্ভিদের ন্যায় জীব ও বায়ু হইতে অঙ্গার (Carbon) গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইতে পারে না। কাজেই এই অবস্থা জীবাবাসের প্রতিকূল। উষ্ণতার মাত্রা পঞ্চাশ অংশের উপরে উঠিলে, উদ্ভিদ মাত্রকেই মৃতপ্রায় হইতে দেখা যায়। সুতরাং, এ অবস্থাকেও কখনো জীবাবাসের উপযোগী বলা যায় না। আগে উদ্ভিদ এবং পরে প্রাণী। কারণ উদ্ভিদ হইতেই প্রাণীর উৎপত্তি এবং উদ্ভিদের অস্তিত্ব লইয়াই প্রাণীর অস্তিত্ব। এজন্য উষ্ণতার উঁচু ও নীচু দিকের দুই সীমার পরে উদ্ভিদের বাঁচা অসম্ভব, প্রাথমিক প্রাণীরও তাহাতে টিঁকিয়া থাকা অসম্ভব।

কাজেই এখন প্রশ্নটি বেশ সহজ হইয়া আসিল। তাপ বিকীরণ করিতে করিতে আমাদের পৃথিবীর অন্ততঃ কিয়দংশ কোন্

সময়ে উষ্ণতার উক্ত দুই সীমার মধ্যবর্ত্তী হইয়াছিল, তাহাই বিচার্য্য। তা' ছাড়া রৌদ্র বৃষ্টি দিন রাত্রির পরিমাণ ইত্যাদির উপর যখন জীবের জীবনমৃত্যু প্রভৃতি ব্যাপার এতটা নির্ভর করিতেছে, তখন পৃথিবীর অপর প্রাকৃতিক অবস্থাগুলিও কতদিন পূর্ব্বে ঠিক্ এখনকার মত হইয়া জীবের আবাসোপযোগী হইয়াছিল, তাহাও স্থির করা আবশ্যক।

জীবরাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল-নির্ণয়ের জন্য জ্যোতিষিকগণের শরণাপন্ন হওয়া বৃথা। তবুও দিবারাত্রির ভেদ এবং সৌর তাপালোকের পরিমাণাদি দ্বারা যখন জীবের স্বাস্থ্যকে নানাপ্রকারে নিয়ন্ত্রিত হইতে দেখা যাইতেছে,তখন এসম্বন্ধে জ্যোতিষিকমতামত গ্রহণ করা কখনো কখনো আবশ্যক হইয়া পড়ে। জ্যোতির্বিকগণের নিকট আমাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, আমরা এখন দিবা ও রাত্রির যে একটি সুন্দর বিভাগ দেখিতে পাইতেছি, তাহা কি পৃথিবীর জন্মকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতির্ব্বিদ্গণ বলেন, দিবারাত্রির বিভাগ জ্যোতিষিক হিসাবে একটা সম্পূর্ণ আধুনিক ব্যাপার। অধিক দিনের কথা নয়, সাতাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে বাবিলনীয় জ্যোতিষিকগণ যে হিসাবে গ্রহণাদির গণনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন আর সে হিসাবে গণনা চলে না। হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, সে সময় পৃথিবীর আবর্ত্তনবেগ (rotation) অধিক স্পষ্ট ছিল, অর্থাৎ তখনকার দিনরাত্রিগুলা ছোট ছোট ছিল। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী এডাম্‌স্ (Adams) সাহেব গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, এখনো পৃথিবীর আবর্ত্তনবেগ প্রতি শতাব্দীতে বাইশ সেকেণ্ড করিয়া কমিয়া আসিতেছে। পরিমাণটা খুব অল্প সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে বিশেষ আসে-যায় না। অতি দূর অতীতকালে পৃথিবী যে অত্যন্ত প্রবল বেগে আবর্ত্তন করিয়া দিনরাত্রিগুলাকে খুব ছোট করিয়া তুলিত, তাহা সুনিশ্চিত।

আবর্ত্তনবেগ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া কোন্ সময়ে এখনকার মত দিবারাত্রির বিভাগ করিয়াছিল, এখন আলোচনা করা যাউক। কোন বর্ত্তুলাকার কোমল জিনিসকে লাটিমের মত ঘুরাইতে থাকিলে, তাহার উপর ও নীচেকার অংশগুলা কেন্দ্রাপসারণী শক্তিতে (centrifugal force) মাঝামাঝি অংশে জমা হইয়া, বর্ত্তুলটাকে চেপ্টা করিয়া দেয়। আমাদের পৃথিবীর আকার অবিকল ঐ বর্ত্তুলের মত হইয়া পড়িয়াছে। যখন পৃথিবী কোমল অবস্থায় ছিল, তখন উহার দৈনিক আবর্ত্তনগতিতে উত্তর দক্ষিণ মেরু সন্নিহিত স্থানের যত গলিত মাটি পাথর বিষুব-প্রদেশে আসিয়া জমা হইয়াছিল। তার পর এই অবস্থাতেই জমাট বাঁধিয়া যাওয়ায়, উহার উত্তর ও দক্ষিণ দিক্‌টা ঠিক তখনকার মতই চাপা থাকিয়া গেছে। চাপার পরিমাণ হিসাব করিতে গেলে দেখা যায়, পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণের ব্যাস পূর্ব্ব পশ্চিমের ব্যাস অপেক্ষা মোটে ২৭ মাইল কম। ইহা হইতে সুবিখ্যাত পণ্ডিত লর্ড কেল্‌ভিন্ (Kelvin) গণনা করিয়াছেন, দশকোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে জমাট বাঁধিলে সেই সময়কার প্রবল আবর্ত্তনবেগে পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ আরো অধিক চাপা হইয়া পড়িত। সুতরাং, দেখা যাইতেছে দশকোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী কখনই জীবের আবাসভূমি ছিল না।

লর্ড কেল্‌ভিন্ এই গণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাপ বিকীরণ করিতে করিতে

কতকালে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ শীতল হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে, তিনি তাহারও এক হিসাব করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় পূর্ব্বোক্ত গণনার ফলের সহিত, এই গণনার ফলের অবিকল ঐক্য দেখা গিয়াছিল। হিসাবটি অতি সহজ। সুড়ঙ্গ খনন করিয়া ভূগর্ভের উত্তাপ পরিমাপ করিতে গেলে দেখা যায়, প্রতি ৫০ বা ৬০ ফিটে এক ডিগ্রি করিয়া উত্তাপ ভিতরের দিকে বাড়িয়া চলিতেছে। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায়, পৃথিবীর উপরকার স্তরগুলি ভিতর হইতে যে তাপ টানিয়া লয় তাহা স্তরে সঞ্চিত থাকিতেছে না। ঐ তাপের এক অজস্র বিকীরণ আসৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে। আমাদের পৃথিবী প্রতি বৎসর যে পরিমাণ তাপ, বিকীরণ দ্বারা ক্ষয় করে, লর্ড কেল্‌ভিন্ তাহার এক হিসাব করিয়াছিলেন। সুতরাং অত্যুষ্ণ গলিত অবস্থা হইতে কঠিন অবস্থায় উপনীত হইতে, পৃথিবী কত কাল অতিবাহন করিয়াছিল, ঐ হিসাব দ্বারা তাহা সহজেই জানা যায়।

দুই গণনায় অবিকল একই ফল হইতে দেখিয়া লর্ড কেল্‌ভিন্ বড়ই বিস্মিত হইয়াছিলেন; এবং দশকোটি বৎসর পূর্ব্বে যে পৃথিবী জীবাবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল তাহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন। এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, দশকোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী বাসের উপযোগী ছিল না সত্য, কিন্তু কোন্ সময় হইতে ইহাতে জীবের উৎপত্তি আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা কি অনুমান করা যায় না? লর্ড কেল্‌ভিন্ শীতাতপ ও জলস্থলের সমাবেশ ইত্যাদির উপর লক্ষ্য রাখিয়া হিসাব করিয়া বলিতেছেন, জীবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কখনই দুই কোটি বৎসরের পূর্ব্বে হয় নাই। দশকোটি বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান সৃষ্টির অভিব্যক্তি আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র, তাহার পূর্ণপরিণতি হইতে এবং ভূপৃষ্ঠ সর্ব্বাংশে জীবাবাসের উপযোগী হইতে উহার পর আট কোটি বৎসর নিশ্চয়ই কাটিয়া গিয়াছিল।

লর্ড কেল্‌ভিনের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটি ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণের মনের মত হয় নাই। জীবরাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল নির্দ্ধারণের জন্য ইঁহারা আর একপ্রথায় গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পাঠক অবশ্যই জানেন, ভূগর্ভ পরীক্ষা করিলে, পর পর সজ্জিত নানা স্তরে, প্রাচীন ও আধুনিক নানা জীবের কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, ঐ সকল স্তরের উৎপত্তি-কালে যে পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। জীবকঙ্কালবিশিষ্ট স্তরগুলি কত দিনে সঞ্চিত হইয়াছিল, ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণ প্রথমে তাহা অবধারণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় ভূগর্ভের প্রায় এক লক্ষ ফিটে ঐ সকল স্তর দেখা গিয়াছিল এবং নদী দ্বারা ধৌত মৃত্তিকা সমুদ্রতলে এক ফুট প্রমাণ স্থূল হইয়া জমিতে, অবস্থা বিশেষে সাত শত বৎসর হইতে কখনো কখনো সাত হাজার বৎসর পর্য্যন্ত অতিবাহন করে, জানা গিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্ গিকি (Sir Archibald Geikie) সাহেব স্তরের স্থূলতা ও তাহাদের উৎপত্তির আনুমানিক কাল লইয়া হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন, জীবকঙ্কাল-বিশিষ্ট নিম্নতম স্তরের উপর যে সকল মাটি পাথর আছে, সে গুলি সঞ্চিত হইতে স্থানবিশেষে সাত কোটি হইতে সত্তর কোটি বৎসর লাগিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, সত্তর কোটি বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের পৃথিবীর উপর জীবের অস্তিত্ব ছিল।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ গিকি সাহেবের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়াইয়া লর্ড কেল্‌ভিনের গণনার ঘোর প্রতিবাদ করিতেছেন এবং মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন অন্ততঃ সত্তর কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে নিশ্চয় জীবের অস্তিত্ব ছিল। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া উক্ত দুই দল পণ্ডিতের কলহ অবিরাম চলিতেছে, কিন্তু কেহই পরাভব স্বীকার করিতেছেন না। গণনার প্রণালী অভ্রান্ত হইলেও যে সকল স্বীকৃত তত্ত্ব (Data) লইয়া দুইদল পণ্ডিত গণনা করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক গলদ্ দেখা যায়। লর্ড কেল্‌ভিন্ বাবিলনীয় জ্যোতিষিকগণের হিসাব পরীক্ষায় পৃথিবীর আবর্ত্তনবেগ কমিয়া আসিতেছে বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে কাহার বেগ কমিয়া আসায় প্রাচীন ও আধুনিক জ্যোতিষিকগণের হিসাবে অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহা লর্ড কেল্‌ভিন্ স্পষ্টতঃ দেখাইতে পারেন নাই। তা'র পর তিনি পৃথিবীর বর্ত্তমান আকার ও তাহার জমাট বাঁধিবার সময়কার আকার অভিন্ন বলিয়া যে একটা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহাতেও আপত্তি চলে। জমাট হইয়া পড়ার পর পৃথিবীর আকারের যে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই বা হইতে পারে না, এ কথা কোন বৈজ্ঞানিকই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। ভূপৃষ্ঠ হইতে কেন্দ্রের দিকে নামিলে উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় সত্য, কিন্তু ভূপৃষ্ঠের সকল অংশেই যে একই মাত্রায় উষ্ণতার বৃদ্ধি পায়, তাহার পরীক্ষা-সিদ্ধ প্রমাণ আজও সংগৃহীত হয় নাই। সুতরাং, গভীরতা বৃদ্ধির সহিত প্রত্যেক পঞ্চাশ ফুটে এক ডিগ্রী পরিমাণ উষ্ণতার বৃদ্ধি স্বীকার করিয়া লইয়া, লর্ড কেল্‌ভিন্ যে গণনা করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে অভ্রান্ত বলা যায় না। ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণের গণনায় স্থলেও ঐ প্রকার অনেক দোষ দেখা যায়। কাজেই জীবের জন্মকাল-সম্বন্ধে উক্ত দুই মতবাদের মধ্যে কোন্‌টি সত্য, তাহা ঠিক্ করিয়া বলা অসম্ভব।

সম্প্রতি কয়েকজন বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ পূর্ব্বোক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের মাঝে দাঁড়াইয়া অভিব্যক্তিবাদ সাহায্যে বিবাদের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহাঁদের ইচ্ছা ছিল, জীবের অভিব্যক্তির একটা কাল নির্ণয় করিয়া নিম্নতম জীব কত দিনে আধুনিক উচ্চতম জীবে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখাইবেন। কিন্তু জীব স্বভাবতঃ কত দিনে অভিব্যক্তির পথে কতটা অগ্রসর হয়, তাহা কোন জীবতত্ত্ববিৎই অনুমান করিতে পারেন নাই। কাজেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। জীবের জন্মকাল নির্দ্ধারণ লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে যে তর্ক কোলাহলের সূচনা হইয়াছে, তাহার শেষ কোথায়, তাহা এখন কেহই বলিতে পারিতেছেন না।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

সুন্দর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের অনুবৃত্তি।

সকল শিল্পকলারই উদ্দেশ্য এক, কিন্তু কার্য্যফল ও কার্য্যপ্রণালী বিভিন্ন। পরস্পরের সহিত কার্য্যপ্রণালী বিনিময় করিয়া, পরস্পরের নির্দ্দিষ্ট সীমা-ব্যবধান লঙ্ঘন করিয়া কোন লাভ নাই। এবিষয়ে আমি প্রাচীন গ্রীকের মতকেই প্রমাণ বলিয়া শিরোধার্য্য করি। কিন্তু অভ্যাসের অভাব বশতই হউক কিম্বা অন্ধসংস্কার বশতই হউক, বিভিন্ন ধাতুময় মূর্ত্তি কিংবা রং-করা মূর্ত্তি আমার তেমন ভাল লাগে না। অমিশ্র উপাদানে গঠিত, অচিত্রিত

মূর্ত্তিই আমার ভাল লাগে। মার্ব্বেলের মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া তাহাতে যে একটা কৃত্রিম মাংসের পেলবতা বিধান করিবার চেষ্টা করা হয় সেটা আমার রুচির সহিত মেলে না। ভাস্কর-সরস্বতী একটু কঠোর-প্রকৃতির দেবতা; কিন্তু তবু তাঁহাতে এমন কতকগুলি বিশেষ সৌন্দর্য্য আছে যাহা অন্য শিল্পকলায় নাই। ভাস্করকলার সহিত বর্ণের কোন সম্বন্ধ না রাখাই ভাল। ভাস্কর-শিল্পে যদি চিত্রকর্ম্ম আনিয়া ফেল, তাহা হইলে বল না কেন, তাহাতে কবিতার ছন্দ ও সঙ্গীতের অনির্দ্দিষ্ট অস্পষ্ট ভাবও আনা যাইতে পারে। যে সঙ্গীতকলা অনুভূতি-মূলক, তাহাকে যদি চিত্রবৎ মূর্ত্তিমান করিবার চেষ্টা কর—সে কি বৃথা চেষ্টা নহে? যে সঙ্গীতগুণী, সমবেত-যন্ত্রসঙ্গীতে সুনিপুণ, তাহাকে একটা ঝড়ের অনুকরণে সঙ্গীত রচনা করিতে বল দেখি। অবশ্য, বাতাসের সোঁসোঁ শব্দের অনুকরণ ও যন্ত্রধ্বনির অনুকরণ করা খুবই সহজ। কিন্তু যে বিদ্যুচ্ছটা যামিনীর তিমিরাবগুণ্ঠনকে সহসা বিদীর্ণ করিয়া ফেলে, কিংবা প্রচণ্ড ঝটিকার সময়, পর্ব্বত সমান যে উত্তুঙ্গ সাগর তরঙ্গ একবার গগন-স্পর্শ করিয়া আবার পরক্ষণে অতল রসাতলে নামিয়া যায়—এই সমস্ত দৃশ্য কি কোন প্রকার স্বর-সম্মিলনে প্রকাশিত হইতে পারে? যদি পূর্ব্ব হইতে শ্রোতাকে জানাইয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে সঙ্গীত-প্রকটিত এই দৃশ্য ঝড়ের দৃশ্য, কি যুদ্ধের দৃশ্য, তাহা কি কেহ নির্ণয় করিতে পারে?—কখনই পারে না। বিজ্ঞানের ও প্রতিভার যতই শক্তি থাকুক না, শব্দের দ্বারা কখনই রূপ চিত্রিত হইতে পারে না। যাহা সঙ্গীতের অসাধ্য তাহা চেষ্টা না করাই সঙ্গীতের পক্ষে সুপরামর্শ। সঙ্গীত, তরঙ্গের উত্থান পতন অনুকরণ করিতে না পারুক, তাহা অপেক্ষা উহা আরও ভাল কাজ করিতে পারে। ঝটিকার বিভিন্ন দৃশ্যে, আমাদের মনে পরম্পরাক্রমে যে সকল ভাবের উদয় হয়, সঙ্গীত সেই ভাব আমাদের মনে উদ্বোধিত করিয়া দেয়। এইরূপেই সঙ্গীতগুণী হেড্নের নিকট চিত্রকরও পরাস্ত হয়; কেন না, চিত্র-কর্ম্ম অপেক্ষাও সঙ্গীত আমাদের অন্তরের অন্তস্তলকে গভীর রূপে আলোড়িত করিয়া তোলে। "কবিতা একপ্রকার চিত্র"—এই কথাটি সাধারণের মধ্যে খুব প্রচলিত। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, কবিতার দ্বারা যে সব কাজ সাধিত হয়, চিত্রের দ্বারা কখনই তাহা সম্যকরূপে হইতে পারে না।

কবিবর ভার্জ্জিল, যশের যে চিত্র আঁকিয়াছেন,—সকলেই তাহার প্রশংসা করে। কিন্তু যদি কোন চিত্রকর এই রূপক কল্পনাটিকে চিত্রের দ্বারা মূর্ত্তিমান করিবার চেষ্টা করেন, যদি ইহাকে এইরূপ একটা অতিকায় দৈত্যরূপে চিত্রিত করেন —যাহার শত মুখ, শত কর্ণ, যাহার পদদ্বয় ধরা ছুঁইয়া আছে এবং যাহার মুণ্ড আকাশের মধ্যে প্রচ্ছন্ন,—এইরূপ মূর্ত্তি কি নিতান্ত হাস্যকর হয় না?

অতএব সকল শিল্পকলারই উদ্দেশ্য সমান, কিন্তু উপায়গুলি সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। এই কারণেই সকল শিল্পকলার একই সাধারণ নিয়ম এবং বিশেষ বিশেষ শিল্প-কলার বিশেষ বিশেষ নিয়ম। এই বিষয়ের সমস্ত খুঁটিনাটি ধরিয়া আলোচনা করিবার আমাদের সময়ও নাই, অধিকারও নাই। আমরা শুধু এই কথাটি পুনর্ব্বার স্মরণ করাইয়া দিব যে, সকল শিল্পকলারই উপর ভাবের পূর্ণ প্রভুত্ব। যে শিল্পরচনা কোন একটা বিশেষ ভাব প্রকাশ না করে,

সে শিল্পরচনার কোন অর্থই নাই। যে শিল্পরচনা কোন একটা বিশেষ ইন্দ্রিয় দিয়া অন্তঃকরণ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে, কোন প্রকার উন্নত চিন্তা,—মর্ম্মস্পর্শী ভাব মনোমধ্যে জাগাইয়া তুলিতে পারে, সেই শিল্পকলাই সার্থক। এই মূল নিয়মটি হইতেই আর সকল নিয়ম প্রসূত হইয়াছে। যেমন মনে কর—কলা-রচনার নিয়ম। রচনাকার্য্যে সাম্য ও বৈষম্য বিষয়ক উপদেশটি বিশেষ রূপে প্রযুজ্য। কিন্তু সাম্যের প্রকৃতি যতক্ষণ না নির্ণীত হয়, ততক্ষণ ইহা শুধু কথামাত্রেই থাকিয়া যায়। ভাবের একতাই প্রকৃত একতা। যে ভাবটি প্রকাশ করিতে হইবে সেই ভাবটি যাহাতে সমস্ত রচনার মধ্যে প্রসারিত হয়, সেই জন্যই বিচিত্রতার প্রয়োজন। বলা বাহুল্য এইরূপ রচনা এবং কৃত্রিম সাম্যরক্ষা ও বিভাগের সুব্যবস্থা—এই উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ভাবব্যঞ্জকতাই প্রকৃত রচনার মুখ্য উপাদান।

ভাবব্যঞ্জকতা হইতে শিল্পকলার শুধু কতকগুলি সাধারণ নিয়ম পাওয়া যায়, তাহা নহে, উহা হইতে এরূপ একটি মূলতত্ত্ব পাওয়া যায় যাহার দ্বারা শিল্পকলাকে বিবিধ শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে।

ফলতঃ শ্রেণীবিভাগ বলিতে গেলেই তাহার মধ্যে একটা সাধারণ মূলতত্ত্ব আছে এইরূপ বুঝায়—এবং সেই মূলতত্ত্বটিই সাধারণ মানদণ্ডের কাজ করে।

কেহ-কেহ আমাদের সুখের মধ্যেও এইরূপ একটি মূলতত্ত্বের অন্বেষণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের মতে, সেই শিল্পই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাহার দ্বারা আমরা সুখানুভব করি। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি যে শিল্পের উদ্দেশ্য সুখ নহে। শিল্পকলা হইতে আমরা ন্যূনাধিক পরিমাণে যে সুখানুভব করি তাহা উহার প্রকৃত মূল্যের পরিমাপক নহে।

শিল্পের প্রকৃত পরিমাপক ভাবব্যঞ্জকতা ভিন্ন আর কিছুই নহে, যেহেতু ভাব প্রকাশ করাই শিল্পের পরম উদ্দেশ্য। অতএব যাহার দ্বারা বেশী ভাব প্রকাশ হয়, শিল্পের মধ্যে সেই শিল্পই অগ্রগণ্য।

প্রকৃত শিল্পকলামাত্রই ভাবব্যঞ্জক, কিন্তু প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ভাব প্রকাশ করে। ধর, সঙ্গীত; এই সঙ্গীতকলা যে সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মস্পর্শী, সর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর, সর্ব্বাপেক্ষা আন্তরিক, তাহাতে কাহারও দ্বিরুক্তি নাই। কি ভৌতিক হিসাবে, কি নৈতিক হিসাবে, মানব-আত্মার সহিত ধ্বনির একটা আশ্চর্য্য যোগ আছে। মনে হয়, আমাদের আত্মা যেন একটা প্রতিধ্বনি, ধ্বনি যাহার দ্বারা একটা নূতন শক্তি লাভ করে। পুরাকালের সঙ্গীতসম্বন্ধে বড়ই অদ্ভুত কাহিনী শুনা যায়। এই সঙ্গীতের প্রভাব পূর্ণরূপে প্রকটিত করিতে হইলে; অতীব আড়ম্বরময় জটিল উপায় অবলম্বন করা যে আবশ্যক তাহাও মনে হয় না। বরং যে সঙ্গীত যত অধিক শব্দকারী সেই পরিমাণে সে তত কম মর্ম্মস্পর্শী। একজন সুকণ্ঠ গায়ক মৃদুস্বরে সঙ্গীতের আলাপ করিয়া আমাদিগকে যেন সপ্তম স্বর্গে উত্তোলন করেন, আকাশের অসীম শূন্যে লইয়া যান, আমাদের চিত্তকে স্বপ্নসাগরে নিমজ্জিত করেন। কল্পনার সম্মুখে একটা অসীম বিচরণভূমি উন্মুক্ত করা—খুব সাদাসিধা সুরের দ্বারা আমাদের অভ্যস্ত হৃদয়-ভাবগুলিকে উত্তেজিত করা, আমাদের ভালবাসার জিনিসগুলিকে জাগাইয়া তোলা—ইহাই সঙ্গীতের বিশেষ-শক্তি। এই হিসাবে, সঙ্গীত অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তথাপি শিল্পকলার মধ্যে সঙ্গীতও সর্ব্বপ্রধান নহে।

সঙ্গীতের অপরিমেয় প্রভাব। অন্য সকল কলা অপেক্ষা সঙ্গীতই বেশী অনন্তের ভাব জাগাইয়া তোলে; কেন না উহার কার্য্যফল অস্পষ্ট, তিমিরাচ্ছন্ন ও অনির্দ্দিষ্ট। এই সঙ্গীতকলা, বাস্তকলার ঠিক্ বিপরীত। বাস্তকলা আমাদিগকে ততটা অনন্তের দিকে লইয়া যায় না, কেন না উহার সমস্তই সুনির্দ্দিষ্ট, সীমাবদ্ধ—এক স্থানে গিয়া উহা থামিয়া যায়। অস্পষ্টতাই সঙ্গীতের বল ও দুর্ব্বলতা—উভয়ই। সঙ্গীত সমস্তই প্রকাশ করে, অথচ বিশেষ কিছুই প্রকাশ করে না। পক্ষান্তরে বাস্তকলা অনির্দ্দিষ্ট কল্পনার হাতে কিছুই ছাড়িয়া দেয় না; এটি অমুক জিনিস কিংবা অমুক জিনিস নহে—বাস্তকলা তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেয়। সঙ্গীত চিত্র করে না, সঙ্গীত মর্ম্মস্পর্শ করে; যে কল্পনা কতকগুলি মানস-প্রতিবিম্বমাত্র,—সঙ্গীত সেরূপ কল্পনার উদ্রেক করে না, পরন্তু সেইরূপ কল্পনার উদ্রেক করে যাহার দ্বারা হৃদয় স্পন্দিত হয়। হৃদয় একবার বিচলিত হইলে, আর সমস্তই বিচলিত হইয়া উঠে; এইরূপ পরোক্ষভাবে সঙ্গীতও কতকগুলি মানস-প্রতিবিম্বকে,—কতকগুলি মনঃকল্পিত রূপকে কিয়ৎপরিমাণে জাগাইয়া তোলে; কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে ও স্বাভাবিকভাবে ইহার শক্তি কল্পনার উপর কিংবা বুদ্ধির উপর প্রকটিত হয় না;—প্রকটিত হয় শুধু হৃদয়ের উপর। সঙ্গীতের পক্ষে ইহাও একটা কম সুবিধার কথা নহে।

সঙ্গীতের রাজ্য—ভাব রসের রাজ্য। কিন্তু ইহাতেও বিস্তার অপেক্ষা গভীরতাই বেশী। সঙ্গীত কতকগুলি ভাবকে খুব সজোরে প্রকাশ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা খুবই কম। সঙ্গীত স্মৃতির পথ দিয়া আনুসঙ্গিকভাবে সকল প্রকার ভাবকেই কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে অতি অল্পসংখ্যক ভাবকেই প্রকাশ করিতে পারে—তাও আবার যে ভাবগুলি খুব সাদাসিধা—যেমন হর্ষ ও বিষাদের সূক্ষ্ম ভেদ সকল—সেই সকল ভাবকেই প্রকাশ করিতে পারে। মহানুভাবতা, কোন সাধু প্রতিজ্ঞা, কিংবা এই জাতীয় অন্য কোন ভাব সঙ্গীতকে প্রকাশ করিতে বল দেখি,—হ্রদ কিংবা পর্ব্বত চিত্রিত করিতে যেমন সে পারিবে না, এই প্রকার ভাব প্রকাশ করিতেও সে তেমনি অসমর্থ হইবে।

সঙ্গীতে, দ্রুত, বিলম্ব, মৃদু, তীব্র এই সকল বিবিধ প্রকারের ধ্বনি প্রযুক্ত হয়—কিন্তু বাকী আর সমস্তই কল্পনার কাজ; কল্পনার যেটি ভাল লাগে কল্পনা সেইটিই গ্রহণ করে। সঙ্গীত একই ছন্দে, একই তালে পর্ব্বতেরও ভাব প্রকাশ করে—সমুদ্রের ভাবও প্রকাশ করে; কোন যোদ্ধৃপুরুষ উহার দ্বারা বীর-রসে মাতিয়া উঠেন—এবং কোন ভগবদ্ভক্ত সাধুপুরুষ উহার দ্বারা ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হয়েন। অবশ্য সঙ্গীতের ভাব অনেক সময়ে বাক্যের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়; কিন্তু সে গুণপনা বাক্যের—সঙ্গীতের নহে। কখন কখন বাক্যের দ্বারা সঙ্গীতে এমন একটা বদ্ধভাব আসিয়া পড়ে, যে তাহার দ্বারা সঙ্গীতের "জান্"টুকু মরিয়া যায়—সঙ্গীতের সেই অস্পষ্ট অনির্দ্দেশ্য কি-জানি-কি ভাবটি চলিয়া যায়—তাহার বিস্তার, তাহার গভীরতা, তাহার অনন্ততা বিনষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, গান কি?—না, স্বরাত্মক বাক্য; কিন্তু সঙ্গীতের এই প্রসিদ্ধ লক্ষণটি আমি কিছুতেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কোন সাদাসিধা সুপঠিত বাক্য, কর্ণবধিরকর সঙ্গীত-সংকৃত

বাক্য অপেক্ষা নিশ্চয়ই ভাল। সঙ্গীতের নিজ প্রকৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখা আবশ্যক; তাহার নিজস্ব দোষগুণ কিছুই তাহা হইতে অপসারিত করা বিধেয় নহে। বিশেষত তাহার স্বকীয় উদ্দেশ্য হইতে তাহাকে বিচ্যুত করিয়া, এমন কিছু তাহার নিকট হইতে চাওয়া উচিত নহে যাহা সে দিতে পারিবে না। জটিল ধরণের কৃত্রিম ভাব কিংবা ইতর ও গ্রাম্য ভাব প্রকাশ করা সঙ্গীতের কাজ নহে। অনন্তের দিকে আত্মাকে উন্নত করাতেই তাহার বিশেষ মনোহারিত্ব। অতএব সঙ্গীত স্বভাবতই ধর্ম্মের সহচর, বিশেষতঃ সেই প্রকার ধর্ম্মের সহচর, যে ধর্ম্ম অনন্তের ধর্ম্ম ও হৃদয়ের ধর্ম্ম—উভয়ই। সঙ্গীত আত্মাকে অনুতাপের প্রস্রবণে লইয়া গিয়া বিমল করিয়া তোলে, আশা ও প্রেমে হৃদয়কে পূর্ণ করে। যাঁহারা রোমে গিয়া পোপভবনে ক্যাথলিক খৃষ্টধর্ম্মের সুগম্ভীর ধর্ম্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহারা ভাগ্যবান্। তৎশ্রবণে ক্ষণেকের জন্য আত্মা যেন স্বর্গের আভাস প্রাপ্ত হয়; দেশ ভেদ, জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ বিচার না করিয়া, সহজ স্বাভাবিক, বিশ্বজনীন ভাবের একটি অদৃশ্য রহস্যময় সোপান দিয়া প্রত্যেক মানব-আত্মাকে ঊর্দ্ধে লইয়া যায়। তখন সংসারের পরপারে সেই শান্তিনিকেতনে যাইবার জন্য মানবের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে।

বাস্তুকলা ও সঙ্গীতকলা—এই দুই বিপরীত ভাবাপন্ন শিল্পকলার মাঝামাঝি স্থানে চিত্রকলা অবস্থিত। চিত্রকলা বাস্তুকলারই মত সুনির্দ্দিষ্ট এবং সঙ্গীতকলারই মত মর্ম্মস্পর্শী। চিত্রকলা পদার্থসমূহের দৃশ্যমান রূপ নির্দ্দেশ করে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটু জীবনের ভাবও প্রদর্শন করে; সঙ্গীতের ন্যায়, চিত্রকলাও আত্মার গভীর ভাবগুলি ব্যক্ত করে—বলিতে গেলে, সকল ভাবই প্রকাশ করে। বল দেখি এমন কোন্ ভাব আছে যাহা চিত্রকরের পটে চিত্রিত না হয়? সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র; ভৌতিক জগৎ, নৈতিক জগৎ কোন বহির্দৃশ্য, সূর্য্যাস্ত, সমুদ্র, রাষ্ট্র-জীবনের ও ধর্ম্মজীবনের বৃহৎ দৃশ্য, সৃষ্টির সমস্ত জীবজন্তু, সর্ব্বোপরি মানুষের মুখশ্রী, সেই মানব-দৃষ্টি যাহা মানব-চিত্তের দর্পণ—সমস্তই তাঁহার চিত্রকর্ম্মের বিষয়। বাস্তুকলা অপেক্ষা অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী, সঙ্গীতকলা অপেক্ষা অধিকতর পরিস্ফুট এই যে চিত্রকলা, ইহা আমাদের মতে, উক্ত কলাদ্বয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কেননা উহা সর্ব্ব প্রকার সৌন্দর্য্য, ও মানব-আত্মার বিচিত্র ভাবসম্পদ প্রকাশ করিয়া থাকে।

কিন্তু সমস্ত কলার মধ্যে কবিতাই শ্রেষ্ঠ; ইহা সকলকেই ছাড়াইয়া উঠে; কেননা ইহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাবব্যঞ্জক।

বাক্যই কবিতার সাধন-যন্ত্র; কবিতা, বাক্যকে আপনার উপযোগী করিয়া গড়িয়া লয়, এবং আদর্শ-সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবার জন্য তাহাকে মনোবস্তুতে পরিণত করে। কবিতা, বাক্যকে ছন্দের দ্বারা সুন্দর করিয়া তোলে; বাক্যকে সামান্য কণ্ঠস্বর ও সঙ্গীত—এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী করিয়া দাঁড় করায়; উহাকে এমন কিছু করিয়া তোলে যাহা মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত—উভয়ই, যাহা আকৃতি ও দেহগঠনের ন্যায় সীমাবদ্ধ পরিস্ফুট, সুনির্দ্দিষ্ট; যাহা বর্ণচ্ছটার ন্যায় জীবন্ত-ভাবাপন্ন, যাহা ধ্বনির ন্যায় মর্ম্মস্পর্শী ও অনন্ত। শব্দ নিজেই—বিশেষতঃ কবিতার নির্ব্বাচিত ও রূপান্তরিত শব্দ—একটা প্রবল বিশ্বজনীন সঙ্কেত। এই শব্দ-মন্ত্রের সাহায্যে, কবিতা প্রত্যক্ষ-জগতের সমস্ত বিচিত্র প্রতিবিম্বকে প্রতিভাত করিতে

পারে—যাহা সঙ্গীতের অসাধ্য ; এবং এক-টার পর একটা এরূপ দ্রুতভাবে প্রকাশ করিতে পারে যে, চিত্রকলা সেরূপ করিয়া উঠিতে পারে না ; আবার বাস্তুকলার ন্যায় উহাদিগকে স্তম্ভিত ও অচল করিয়াও রাখিতে পারে। কবিতা যে শুধু এই সমস্তই প্রকাশ করে তাহা নহে, উহা আরও কিছু প্রকাশ করে যাহা অন্য সমস্ত কলার অনধিগম্য; অর্থাৎ উহা চিন্তাবস্তুকে প্রকাশ করে, যাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে, এমন কি হৃদয়ের ভাব হইতেও সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ; —সেই চিন্তাবস্তু যাহার কোন রূপ নাই, সেই চিন্তাবস্তু যাহার কোন বর্ণ নাই, সেই চিন্তাবস্তু যাহা হইতে কোন শব্দ নিঃসৃত হয় না, সেই চিন্তাবস্তু যাহা কাহারও দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় না, সেই চিন্তাবস্তু যাহা জগৎ ছাড়াইয়া কোথায় যেন উধাও হইয়া ঊর্দ্ধে গমন করে—সেই চিন্তাবস্তু যাহা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর।

ভাবিয়া দেখ,—"স্বদেশ" এই শব্দটির দ্বারা কত মানস-ছবি, কত হৃদয়-ভাব, পরিস্ফুট হয়, কত চিন্তাই আমাদের মনে উদ্রিক্ত হয় ; "ঈশ্বর"—এই শব্দটি যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি বৃহৎ, ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্ট অথচ গভীর ও ব্যাপক শব্দ আর কি আছে ?

বাস্তুশিল্পীকে, ভাস্করকে, চিত্রকরকে, এমন কি সঙ্গীতাচার্য্যকে—প্রকৃতি ও আত্মার সমস্ত শক্তিকে একাধারে প্রকাশ করিতে বল দেখি ;—তাহারা কখনই পারিবে না ; এবং ইহাতে করিয়াই প্রকারান্তরে কবিতার শ্রেষ্ঠতা তাহাদের স্বীকার করা হয়। এই শ্রেষ্ঠতা উহারা আপনা হইতেই ঘোষণা করে, কেননা কবিতাকেই উহারা নিজ নিজ রচনার সৌন্দর্য্য-পরিমাপক রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে ; তাহাদের রচনা, কবিত্ব-আদর্শের যতটা কাছাকাছি যায় ততই তাহাদের নিকট আদরণীয় হইয়া থাকে। কলাগুণীদিগের ন্যায় জনসাধারণও এই ভাবে কার্য্য করে। কোন সুন্দর চিত্র দেখিয়া, জীবন্তবৎ ভাবব্যঞ্জক কোন মূর্ত্তি দেখিয়া, একটি মহৎ ভাবের সুর শুনিয়া, তাহারা বলিয়া উঠে, : "আহা কি কবিত্ব"। ইহা কেবল একটা খামখেয়ালি তুলনা মাত্র নহে ; কিন্তু কবিতাই যে কলার পূর্ণ আদর্শ, সকলের শ্রেষ্ঠ, সকল কলাই যে ইহার অন্তর্গত, সকল কলাই উহার নিকটে উপনীত হইতে আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু কেহই উপনীত হইতে পারে না—ইহা স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিরই কথা।

মানব-বাক্য কবিতা-কর্ত্তৃক ভাবের আকারে পরিণত হইলে, উহাই সঙ্গীতের ন্যায় গভীরতা ও উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়। কবিতা যেমন দীপ্তিমান তেমনি মর্ম্মস্পর্শী ; ইহা যেমন মনের সঙ্গে,—তেমনি হৃদয়ের সঙ্গে কথা কহে। সকল প্রকার দ্বন্দ্বভাবের সাদৃশ্য —বিপরীত ভাবের সাদৃশ্য কবিতার মধ্যে উপলব্ধি হয়। অথচ এই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়া উহার প্রভাব যেন দ্বিগুনিত হয়। কবিতার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ছবি, সর্ব্বপ্রকার ভাবরস, সর্ব্বপ্রকার মনোবৃত্তি, মনের সকল দিক্, পদার্থের সর্ব্বাংশ, সমস্ত দৃশ্যমান্ জগৎ, সমস্ত অদৃশ্য জগৎ—সমস্তই পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায় ও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাই কবিতার সহিত আর কোন কলার তুলনা হয় না। ইহা অননুকরণীয়।

অপৌত্তলিক উপাসনা।

আমরা ব্রাহ্ম হইয়া যে অপৌত্তলিক উপাসনা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তার তাৎপর্য্য কি ? কেন আমরা এই ব্রতে ব্রতী হইয়া

প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম হইতে কতক পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি? "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" কিসের জন্য আমাদের এই প্রতিজ্ঞা। পিতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হওয়া স্বীকার, তবুও কেন রামমোহন রায় এই ব্রতরক্ষায় তৎপর হইয়া ছিলেন? মহর্ষি পিতৃদেব কিসের জন্য গৃহবিচ্ছেদ লাঞ্ছনা গঞ্জনা—এত আত্মত্যাগ স্বীকার করিলেন? উত্তর এই যে পৌত্তলিক উপাসনায় তাঁহাদের আত্মার শান্তি—আত্মার তৃপ্তি হয় নাই। যাঁহাকে পাইয়া ঋষিরা জ্ঞানতৃপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সন্ধানে তাঁহারা ব্যাকুল চিত্তে ফিরিতে লাগিলেন, পরে সেই অনন্ত-দেবের দর্শন লাভে কৃতার্থ হইলেন। সেই অতীন্দ্রিয়, অমূর্ত্ত ঈশ্বরের উপাসনা-প্রচার তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইল। আমরাও দেখিতেছি এদেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা নানাকারণে দুর্গতি লাভ করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, তোমরা এই পৌত্তলিক উপাসনায় এত বীতরাগ কেন; যাঁহারা মূর্ত্তি-পূজক তাঁহারা ত কেহ জ্ঞাতসারে কেহ বা অজ্ঞাতসারে সেই একেরই উপাসনা করেন; ইহাঁদের সঙ্গে যোগরক্ষা করা সত্য সত্যই কি কঠিন। তাহার সম্বন্ধে আমাদের উত্তর এই,—

১। প্রথমতঃ, আমরা জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের স্বরূপকে খর্ব্ব করিতে পারি না—অসত্যকে সত্য রূপে বরণ করিতে পারি না। আমরা যে ঈশ্বরকে চাই, তাঁহার স্বরূপ ভিন্ন। তিনি সত্যং জ্ঞানং অনন্তং—দেশেতে কালেতে তিনি সীমাবদ্ধ নন—তিনি অচেতন জড় নহেন, কিন্তু শুদ্ধ-বুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপ। আমরা জানিয়া শুনিয়া কি রূপে তাঁহার স্বরূপ খর্ব্ব করিব। ইহাতে আমরা আপনাদের চক্ষে অপনারাই হীন হই। অশিক্ষিত অজ্ঞান লোকেরা না বুঝিয়া যাহা করে করুক—তাহাদিগকে বলিব যে পৌত্তলিক উপাসনা সোপানমাত্র—এ সোপান অতিক্রম করিয়া আরো উচ্চে উঠিতে হইবে। কিন্তু জ্ঞানী যাঁরা—বিজ্ঞ ও শিক্ষিত যাঁরা, তাঁহারা আপনাদের আদর্শকে উন্নত করুন, আপনার অধিকারকে প্রশস্ত করুন। বহু দেবতার স্থানে উপনিষদ প্রদর্শিত অমূর্ত্ত একেশ্বরের উপাসনা গ্রহণ করুন।

২। দেবমূর্ত্তিকে—প্রতিমাকে সত্য মনে করিতে হইলে, আসলে নকলে কতক সাদৃশ্য চাই। যেমন বন্ধুর অবর্ত্তমানে আমরা তাঁর ছবি রাখি—এই ছবি জীবন্ত মূর্ত্তির যত কাছাকাছি হয়, ততই আদরণীয়। কিন্তু যদি মানুষের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে অন্য কিছু গড়াইয়া রাখি, তাহা হইলে কি তাহা আমার বন্ধুকে স্মরণ করিবার সাহায্য করে? নৃমুণ্ডমালিনী, খড়্গহস্তা, লোলজিহ্বা, পতিবক্ষোপরি দণ্ডায়মানা কালীমূর্ত্তি দেখিয়া সেই করুণাময় মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কারুণ্যভাব কি কাহারো নিকট প্রতিভাত হইতে পারে? এই কি সেই মঙ্গল সুন্দর মোহনমূর্ত্তির প্রতিরূপ, না নিরাহপশুবলির রক্তস্রাব তাঁর পাবনী পালনী শক্তির উদ্দীপক ও পরিচায়ক? এই যে শালগ্রাম এইবা কিরূপে সেই অনন্তদেবের স্মৃতি-চিহ্ন হইতে পারে? উহা হইতে কি সেই জ্ঞানোজ্জ্বল সত্যস্বরূপের আভা মনে স্থান পায়? এই যে পরিমিত সীমাবিশিষ্ট মন্দিরের বিভিন্ন-রূপী মূর্ত্তি সকল ইহা কি সাধককে সেই অনন্তজ্ঞানস্বরূপে পৌঁছিয়া দিতে পারে?

আপনারা দয়ানন্দ সরস্বতীর নাম শুনিয়া থাকিবেন—তিনি আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা।